POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

আল্লাহ্‌র বাণী

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ
بِالۡهُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ
عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ۙ وَلَوۡ کَرِهَ
الۡمُشۡرِکُوۡنَ (الصّف:10)

তিনিই তাঁহার রসুলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

(আস সফ: ১০))

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 5-6

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 2-9 ফেব্রুয়ারী, 2023 10-17 রজব 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সর্বশক্তিমান খোদা যিনি পরম দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী, আমাকে তাঁর ইলহামে সম্বোধন করে বলেছেন:

"আমি তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী- তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কান্না শুনেছি। এবং তোমার দোয়াসমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি রবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানা) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি।

"সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী, তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্যতার যাবতীয় আশিসসমূহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব এবং তাঁর রসূলে পাক মহম্মদ (সাঃ) কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে, তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন পায় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়। "সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন এবং পবিত্র-পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে।"

"সুশ্রী, পবিত্র-পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে। সে কলুষ থেকে পবিত্র। সে আল্লাহর নূর। ধন্য, যে আকাশ থেকে আসে। তার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে এবং তার সঞ্জীবনী-শক্তি ও পবিত্র আত্মার প্রসাদ বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করবে। সে 'কালিমাতুল্লাহ্'- আল্লাহ্‌তা'লার বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান' এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝি নি) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়-পুত্র।

مَظۡهَرُ الۡاَوَّلِ وَالۡاٰخِرِ - مَظۡهَرُ الۡحَقِّ وَ الۡعَلَاءِ - کَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ "অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল ও সুউচ্চ, যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমন বিশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে নিজ আত্মা দান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথায় থাকবে। সে শীঘ্রই বর্ধিত হবে, বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।

وَکَانَ اَمۡرًا مَّقۡضِیًّا অর্থাৎ এটাই আল্লাহর অটল মিমাংসা"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মুসলেহ মওউদ সংখ্যা

ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)এর বাণীর আলোকে।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ আদেশে ১৯০৫ সালে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার ভিত রাখেন এবং আল ওসিয়্যত পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার নিদের্শে জামাতের পুণ্যবান, পবিত্রবান ও মুত্তাকি বান্দাদের শেষ বিছানা তৈরীর জন্য একটি কবরস্থান তৈরী করেন আর এতে দফন হওয়ার জন্য শর্ত রাখেন যে, এমন ব্যক্তি নিজের উপার্জনের এক-দশমাংশ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য জামাতকে দান করবে।আর মৃত্যুর পর নিজের সমস্ত সম্পত্তির, তা কম হোক বা বেশি, এক-দশমাংশ ওসীয়ত করবে। আল্লাহ তা'লা তাঁকে এই কবরস্থানের নাম বলেন বেহেশতি মাকবারা।

বেহেশতি মাকবারায় সমাহিত হওয়ার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উপরোক্ত যে শর্তাবলী রেখেছেন, সেটি এতবড় কুরবানী যে, আমাদের বিশ্বাস, ইসলামের জন্য এত বড় কুরবানী সম্পাদনকারী অবশ্যই জান্নাতী হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই কবরস্তানে এবং এতে সমাহিত ব্যক্তিদের জন্য অনেক দোয়া করেছেন। তিনি বলেন-

"আবার আমি দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এ ভূমিখন্ডকে আমার জামা'তের সেই পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত করো যাঁরা প্রকৃতই তোমার হয়ে গেছেন এবং যাঁদের কাজকর্মে পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ নেই। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

পুনরায়, আমি তৃতীয়বার দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান ও দয়ালু, হে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় খোদা! তুমি শুধু সেসব লোককে এখানে কবরের জায়গা দান কর যাঁরা তোমার এ প্রেরিতের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখেন এবং কোন প্রকার কপটতা, স্বার্থপরতা ও অন্যায় সন্দেহ নিজেদের অন্তরে পোষণ না করলে এবং ঈমান ও অনুবর্তিতার দাবিসমূহ পূরণ করে থাকেন এবং তোমারই জন্য ও তোমারই পথে আন্তরিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করেছেন, যাঁদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং যাঁদের সম্বন্ধে তুমি জানো যে, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রেমে বিলীন হয়ে গেছেন এবং তোমার প্রেরিতজনের সাথে বিশ্বস্ততা, পূর্ণ শিষ্টাচার ও অকপট বিশ্বসের সাথে প্রেম ও মরণ-পণ সম্পর্ক রাখেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

যদিও প্রতি মাসে আয়ের এক-দশমাংশ, এবং মৃত্যুর পর সম্পত্তির এক-দশমাংশ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য দান করা অনেক বড় ত্যাগস্বীকার আর জামাতের সদস্যদের এক বিরাট অংশ ধৈর্য, অবিচলতা এবং খুশি মনে এই কুরবানী করছে। বরং এমন মানুষ অনেকে আছে যারা এর থেকে বেশি কুরবানী করছে। আল হামদোলিল্লাহ। তবুও আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আঁ হযরত (সা.) -এর সাহাবাদের কাছে সম্পদের পাশাপাশি প্রাণের কুরবানীও চাওয়া হত। তাঁরা সম্পদের কুরবানীর পাশাপাশি খোদার রাস্তায় নির্দ্বিধায় নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে ইসলামকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা কেবল সম্পদের কুরবানী চাইছি, প্রাণের কুরবানী চাইছি না। আজ ইসলামকে সমগ্র সমগ্র বিশ্বে জয়যুক্ত করা মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের দায়িত্ব। ইসলাম তো অব্যশই পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে, কিন্তু আমাদের এটা দেখতে হবে যে, আমরা এতে কতটা অংশগ্রহণ করেছি। আল্লাহ্র আদেশ ও কল্যাণেই সম্পদ আসে। অতএব, সেটিকে আঁকড়ে ধরে না রেখে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করা এবং নিজেদের পরকালের জন্য কিছু পাথেয় জোগাড় করাই প্রকৃত বিচক্ষণতা ও সৌভাগ্যের কথা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০০৪ সালে এই ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেন যে, ২০০৮ সাল পর্যন্ত, যেটি খিলাফতের জুবিলি সাল, জামাতের উপার্জনশীল ব্যক্তিাদের অর্ধাংশ যেন ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আমরা এখনও পর্যন্ত হুযুরের এই ইচ্ছেকে বাস্তবায়িত করতে পারি নি। আল্লাহ করুন, আমরা যেন অচিরেই ওসীয়্যতের আশিসময় ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের পরকাল সুসজ্জিত করি। নিম্নে ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণের বিষয়ে সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল।

সূচিপত্র

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী	১
সম্পাদকীয়	২
হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত খুতবা জুমা	৩
হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর কুরআনের সেবা	১০
শুদ্ধি আন্দোলন এবং মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পর্ক	১৩
মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি ও গুরুত্ব।	১৯
হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২২)	২৩

*****❖*****❖*****❖*****

ঈমানের পরিপূর্ণতার নির্দেশক হিসেবে ওসীয়্যত হল মাপকাঠি।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

জামাতের সামনে ওসীয়্যতের গুরুত্ব তুলে ধরা উচিত আর বলা উচিত এটি খোদা তা'লার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা। এমনটি হলে, আমার ধারণা, হাজার হাজার মানুষ যারা এখনও এদিকে মনোযোগ দেয় না, তারা ওসীয়্যতের মাধ্যমে নিজেদের ঈমান পূর্ণ করে দেখোবে। ..... ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা খোদা তা'লার তাহরীক আর এর সঙ্গে বহু পুরস্কার সম্পৃক্ত। এখনও পর্যন্ত যারা ওসীয়্যত করে নি তারা ওসীয়্যত করে নিজেদের ঈমানের পূর্ণতার প্রমাণ দিন। কেননা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন, যে ব্যক্তি ওসীয়্যত করে না, তার ঈমানে আমার সন্দেহ আছে। অতএব, ওসীয়্যত হল ঈমান পূর্ণ হওয়ার মানদণ্ড।

ওসীয়্যত ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার ব্যবহারিক প্রমাণ

আমি জামাতের সদস্যদেরকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, ওসীয়্যতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটিকে এমন বিশেষত্ব দান করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ইলহামের অধীনে একে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে কোনও মোমেন এর গুরুত্ব ও মহত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমগ্র ব্যবস্থাপনাই আসমানী আর ঐশী ইলহামী ব্যবস্থাপনা। কিন্তু ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা খোদা তা'লার বিশেষ ইলহামের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য বিষয়গুলি সাধারণ ইলহামের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু ওসীয়্যতের বিষয়টি বিশেষ ইলহামের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার একটি ব্যবহারিক প্রমাণ। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকারটি একটি চুক্তি ছিল। সেই চুক্তি মেনে চলতে অনেক মোমেন বড় বড় ত্যাগস্বীকার করে, আর অনেকে এই চুক্তি করে নীরবে বসে থাকে। এছাড়াও এমনও অনেক মানুষ থাকেন যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিতে চায় কিন্তু এর জন্য তারা উপায় খুঁজে পায় না আর, কি করতে হবে সে কথা তাদের জানা থাকে না। ..... এছাড়াও যারা এই চুক্তি পালন করার চেষ্টা করছিল তারা জানত না যে তাদের চুক্তি রক্ষা হচ্ছে কি না।.....

তখন খোদা তা'লার করুণা উদ্বেলিত হয় আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন যে, যারা জানতে চায় যে তাদের অঙ্গীকার রক্ষা হচ্ছে কি না, তাদের জন্য এই ওসীয়তের পথ রয়েছে, এই পথে চলে তারা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে, কেননা ওসীয়্যতে শর্ত রয়েছে-

"খোদাতা'লার অভিপ্রায় এই যে, এমন কামেল ঈমানদাররা যেন একই জায়গায় সমাহিত হোন যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা একই স্থানে তাদেরকে দেখতে পেয়ে নিজেদের ঈমান তাজা করতে পারে"

তাই এটা কিভাবে সম্ভব যে, কোনও ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নির্দেশিত পথে ওসীয়্যত করল, এর প্রতিষ্ঠিত থাকল অথচ তার ঈমান পূর্ণতা পেল না! তাই যে সব মানুষের মনে অশান্তি ছিল আর তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছে

এরপর ৯ পাতায়....

জুমআর খুতবা

কাল রাত্রিতে আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করি, তখন দেখি, জাফর ফিরিশাতদের সঙ্গে উড্ডয়ন করছে আর হামজা সিংহাসনে ঠেসা দিয়ে বসে আছে। (হাদীস)

কতিপয় সাহাবী যাদের সম্পর্কে পূর্বে স্মৃতিচারণ করেছি তাঁদের সম্পর্কে কিছু তথ্য বা বিস্তারিত বিবরণ পরে হস্তগত হয়েছে।.....

এজন্য আমি সমীচীন মনে করেছি যে, এগুলোও কয়েকটি খুতবায় বর্ণনা করে দিই যেন এর মাধ্যমেও মানুষ এসব বিষয় অবগত হয়ে যায় এবং বেশি বেশি মানুষ (তা) শুনতে পায়।

নবী (সা.)-এর নিকট হামযা নামটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

আমি দোয়াশেষ করার পূর্বেই মিথ্যা আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যায় এবং আমার হৃদয় দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এরপর সকালে আমি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে আমার সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করি তখন মহানবী (সা.) আমার জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে অবিচলতা দান করেন।

[হযরত হামযা (রা.)]

হে কুরায়েশবাসী! আমি দেখেছি, মুসলমানদের বাহিনীতে উটনীর হাওদাগুলো নিজেদের ওপর মানুষ নয় বরং মৃত লাশ বহন করছে এবং মদীনার উষ্ট্রীগুলোয় যেন মৃত্যু আরোহন করে আছে।"

(এক মুশরিকের স্বীকারুক্তি)

পরবতীতে মদ্যপান হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার পর এসব লোক এর ধারে কাছেও ঘেষেন নি। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে এমন ছিল সাহাবীদের মানদণ্ড। তাৎক্ষণিভাবে মদের কলসগুলি ভেঙে ফেলেন। ইহুদীরা যখন লক্ষ্য করল মুসলমানরা মদীনায় অধিক ক্ষমতাধর হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের আচরণ বদলাতে থাকে। ফলে তারা মুসলমানদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করার সঙ্কল্প করে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা বৈধ-অবৈধ সকল পন্থা অবলম্বন করতে আরম্ভ করে।

আঁ হযরত (সা.)-এর চাচা মহা মর্যাদাবান সাহাবী হযরত হামযা (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

বিশ্বের পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে উঠছে, এমতাবস্থায় নতুন বছরের সূচনায় বিশেষ দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (৩০ ফাতাহ নবুয়ত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ শেষে আমি বলেছিলাম, বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ যদিও এখানে শেষ হলো, কিন্তু কতিপয় সাহাবী যাদের সম্পর্কে পূর্বে স্মৃতিচারণ করেছি তাঁদের সম্পর্কে কিছু তথ্য বা বিস্তারিত বিবরণ পরে হস্তগত হয়েছে। এগুলো হয় আমি কোনো এক সময় বর্ণনা করব নতুবা যখন এগুলো ছাপা হবে তখন তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অনেকে (আমাকে পত্র) লিখছেন, এসব ইতিহাস শুনে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। এসব অংশও খুতবায় বর্ণনা করে দিন। এজন্য আমি সমীচীন মনে করেছি যে, এগুলোও কয়েকটি খুতবায় বর্ণনা করে দিই যেন এর মাধ্যমেও মানুষ এসব বিষয় অবগত হয়ে যায় এবং বেশি বেশি মানুষ (তা) শুনতে পায়।

যাহোক, এ প্রসঙ্গে প্রথম স্মৃতিচারণ হলো হযরত হামযা (রা.)-এর। তিনি মহানবী (সা.)-এর চাচা ছিলেন আর তাঁর (সা.) অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন যা মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন কথায় এবং হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদতের পর মহানবী (সা.)-এর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এর মাঝে সংক্ষেপে কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তিও হতে পারে।

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হামযা নামটি মহানবী (সা.) -এর খুবই পছন্দের ছিল। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের একজনের বাড়িতে পুত্রসন্তান জন্ম নিলেসে [মহানবী (সা.)-কে] জিজ্ঞেস করে, আমরা তার কী নাম রাখব? মহানবী (সা.) বলেন, এর নাম হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের নামের সাথে মিলিয়ে রাখ যা আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দের নাম।

(মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩১)

হযরত হামযা (রা.)-এর সহধর্মিনীগণ ও সন্তানসন্ততির বিষয়ে তাবাকাতে কুবরায় লেখা আছে, হযরত হামযা (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল অওস গোত্রের মিল্লা বিন মালেকের মেয়ের সাথে, যার গর্ভে ইয়ালা ও আমের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র ইয়ালার নামের কারণেই হযরত হামযা (রা.)-এর ডাকনাম ছিল 'আবু ইয়ালা'। হযরত হামযা (রা.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত খওলা বিনতে কায়েস আনসারীয়ার গর্ভে তাঁর কন্যা হযরত উমারা জন্মগ্রহণ করেন যার নামের সাথে মিলিয়ে হযরত হামযা নিজের ডাকনাম রেখেছিলেন 'আবু উমারা'। হযরত হামযা (রা.)-এর আরেকটি বিয়ে হয় হযরত আসমা বিনতে উমায়েসের বোন হযরত সালমা বিনতে উমায়েসের সাথে, যার গর্ভে এক কন্যা হযরত উমামার জন্ম হয়। ইনি সেই উমামা যার সম্পর্কে হযরত আলী, হযরত জা'ফর ও হযরত যায়েদ বিন হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়েছিল। তারা প্রত্যেকেই হযরত উমামাকে নিজের কাছে রাখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) হযরত জা'ফর বিন আবী তালেব (রা.)-এর অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন, কেননা হযরত উমামার খালা হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) হযরত জা'ফর (রা.)-এর সহধর্মিনী ছিলেন। হযরত হামযা (রা.)-এর পুত্র ইয়ালার সন্তানদের মধ্যে ছিলেন উমারা, ফযল, যুবায়ের, আকীল এবং মুহাম্মদ। কিন্তু তারা সবাই মারা যান। হযরত হামযার কোনো সন্তানই জীবিত ছিলেন না, ফলে তাঁর বংশও বিস্তার লাভ করে নি।

(তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬)

হযরত হামযার কন্যা উমামা সম্পর্কে হযরত আলী, হযরত জা'ফর ও হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর মধ্যের যে দ্বন্দ্বের কথা মাত্রই উল্লেখ করা হলো তার বিশদ বিবরণ বুখারী শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,হযরত বারা বিন আযেবের পক্ষ রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী

(সা.) যখন যিলক্বদ মাসে উমরা করার সিদ্ধান্ত নেন তখন মক্কাবাসী তঁাকে (সা.) মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি (সা.) তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, তিনি আগামী বছর মক্কায় উমরা করতে আসবেন এবং তিন দিন অবস্থান করবেন। যখন চুক্তিপত্র লেখা শুরু হয়, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, এগুলো সেই শর্ত যার ওপর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) চুক্তি করেছেন। মক্কাবাসীরাবলতে আরম্ভ করে, আমরা এটি মানি না। আমরা যদি বু ঝতাম, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল (তাহলে) আপনাকে আমরা কখনোই বাধা দিতাম না বরং এখানে আপনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (লিখুন)। তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূলও এবং মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্‌ও। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, রসূলুল্লাহ্ শব্দটি মুছে ফেল। আলী (রা.) বলেন, কখনোই মুছবো না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনার উপাধী কখনোই মুছবো না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) লিখিত কাগজটি নিয়ে নেন আর তিনি (সা.) ভালো মত লিখতে জানতেন না। তিনি (সা.) লিখেন, এগুলো সেই শর্ত যা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ নির্ধারণ করেছে। খাপবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোনো অস্ত্র মক্কায় আনা হবে না এবং মক্কাবাসীদের কেউ আমাদের সাথে যেতে চাইলেও তাকে সাথে নেওয়া হবে না। কিন্তু নিজের সঙ্গীদের মাঝ থেকে কেউ যদি মক্কায় থেকে যেতে চায় তাহলে তাকে বাধা দেয়া হবে না। যাহোক, তিনি (সা.) যখন চুক্তি অনুযায়ী পরের বছর মক্কায় প্রবেশ করেন এবং নির্ধারিত সময় পার হয়ে যায় তখন কুরাইশরা হযরত আলী (রা.)-এর নিকটে এসে বলে, তোমার সাথি, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-কে বলো,এখন যেন তিনি এখান থেকে চলে যান, কেননা নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। অতএব মহানবী (সা.) সেখান থেকে যাত্রা করেন। হযরত হামযা (রা.)-এর কন্যা তাঁর পেছনে পেছনে আসছিলেন আর ডাকছিলেন হে চাচা! হে চাচা! হযরত আলী (রা.) গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন, তার হাত ধরেন এবং হযরত ফাতেমা (আ.)-কে বলেন, তোমার চাচার কন্যাকে নিয়ে নাও। তিনি তাকে বাহনে তুলে নেন। এরপর আলী, যায়েদ এবং জা'ফর (রা.) হামযার কন্যার বিষয়ে বিতর্ক করতে আরম্ভ করেন। আলী (রা.) বলেন, আমি তাকে এনেছি আর সে আমার চাচার কন্যা। জা'ফর (রা.) বলেন, সে আমার চাচার কন্যা আর তার খালা আমার স্ত্রী আর যায়েদ (রা.) বলেন, সে আমার ভাইয়ের কন্যা। অতঃপর মহনবী (সা.) তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন, সে তার খালার কাছে থাকবে আর একই সাথে বলেন, খালা মাতৃতুল্য। আবার আলী (রা.)-কে বলেন, তুমি আমার আর আমি তোমার। এছাড়া জা'ফর (রা.)-কে বলেন, চেহারা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তুমি আমার সাথে সাদৃশ্য রাখ আর যায়েদ (রা.)-কে বলেন, তুমি আমার ভাই এবং বন্ধু। আলী (রা.) নিবেদন করেন, আপনি কি হামযার কন্যাকে বিয়ে করতে পারেন না? তখন তিনি (সা.) বলেন, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা এবং আমি তার চাচা।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪২৫১)

এসব ঘটনার মাধ্যমে এই ছোটোখাটো বিষয়ের সমাধানও হয়ে যায়। কখনো কখনো কাযা বা বিচার বিভাগে অভিযোগ আসে যে, খালার কাছে কেন যাবে? নানির কাছে কেন যাবে? অতএব এখানে (এ ঘটনার মাধ্যমে) এর সমাধান হয়ে গিয়েছে।

হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রওযুল উনুফ পুস্তকে লিখিত আছে, ইবনে ইসহাক ছাড়াও কেউ কেউ হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে একটি অতিরিক্ত কথা যোগ করেছেন। হযরত হামযা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আমি ক্রোধান্বিত হই আর আমি বলে বসি [অর্থাৎ তার ক্রীতদাসীর কথার প্রেক্ষিতে যে-সব ঘটনা ঘটে তা পূর্বে বর্ণি না করা হয়েছে] আমি মহানবী (সা.)-এর ধর্মে বিশ্বাস রাখি। পরে আমার অনুশোচনা হয়, অর্থাৎ আমি আমার পিতৃপুরুষ এবং জাতির ধর্ম ত্যাগ করেছি। এছাড়া আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংশয় ও সন্দেহের মাঝে সারা রাত এমনভাবে অতিবাহিত করি যে, এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমাতে পারি নি। এরপর আমি কা'বাগৃহের পাশে আসি এবং আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কাকুতিমিনতি করে দোয়া করি, আল্লাহ্ তুমি আমার বক্ষকে সত্যের জন্য উন্মুক্ত করে দাও আর আমার ভেতর থেকে সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দাও।

আমি দোয়াশেষ করার পূর্বেই মিথ্যা আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যায় এবং আমার হৃদয় দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এরপর সকালে আমি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে আমার সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করি তখন মহানবী (সা.) আমার জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে অবিচলতা দান করেন। (রাউযুল উনাফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪-৪৫)

হযরত আম্মার বিন আবু আম্মার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিবেদন করেন, তাকে যেন জিব্রাঈল (আ.)-এর প্রকৃত রূপ দেখানো হয়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাকে দেখার শক্তি বা সামর্থ্য তোমার নেই। তিনি নিবেদন করেন, কেন নেই? তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি দেখতেই চাও তাহলে নিজের জায়গায় বসে পড়। বর্ণানাকারী বলেন, তারপর জিব্রাঈল (আ.) কাবাগৃহের সেই কাষ্ঠখণ্ডের ওপর অবতীর্ণ হন যেখানে মুশরিকরা তওয়াফ করার সময় নিজেদের কাপড় রাখত। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, নিজের চোখ তুলে তাকাও আর দেখ।

ফলে তিনি তাকিয়ে দেখেন, তাঁর, অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ.)-এর দুই পা সবুজ যবরজদের (মণির) মত। অতঃপর তিনি অচেতন হয়ে পড়ে যান।

যবরজদ হলো একটি মূল্যবান পাথর, যেটি নীলকান্তমণির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ । (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮)

দ্বিতীয় হিজরী সনের সফর মাসে মহানবী (সা.) মুহাজেরদের একটি দলের সাথে মদীনা থেকে 'আবওয়া' অভিমুখে যাত্রা করেন যাতে হযরত হামযা (রা.)ও অংশগ্র হণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই অভিযানে মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত হামযা (রা.)ই বহন করেন যা ছিল সাদা রঙের ছিল। তিনি (সা.) তাঁর অনুপস্থিতিতে হযরত আবু সা'দ (রা.) বা অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতঅনুযায়ী হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। এই অভিযানে যুদ্ধ হয় নি, কিন্তু বনু যামরাহ্‌র সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এটি প্রথম যুদ্ধ ছিল যাতে মহানবী (সা.) স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধের আরেকটি নাম ওয়াদ্দানও বটে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেন,দ্বিতীয় হিজরী সনের সফর মাসে তরবারির যুদ্ধের অনুমতি নাযেল হয়। কেননা কুরাইশদের রক্তপাতের ষড়যন্ত্র এবং তাদের ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডের বিপরীতে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি (সা.) এই মাসেই মুহাজেরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার নামে মদীনা থেকে বের হন। যাত্রার পূর্বে তিনি (সা.) তঁার অবর্তমানে খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদা (রা.)কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন এবং মদীনা থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মক্কার পথে যাত্রা করেন এবং অবশেষে ওয়াদ্দান নামক স্থানে পৌঁছান। অত্রাঞ্চলেবনু যামরাহ্ গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। এই গোত্রটি বনু কিনানার একটি শাখা ছিল আর এভাবে তারা কুরাইশদের চাচাত ভাই ছিল। এখানে পৌঁছে মহানবী (সা.) বনু যামরাহ্ গোত্রের নেতার সাথে আলোচনা করেন এবং উভয় পক্ষের সম্মতিতে পরস্পরের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যার শর্তাবলী ছিল, বনু যামরাহ্ মুসলমানদের সাথে মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে সাহায্য করবে না। এছাড়া মহানবী (সা.) তাদেরকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ডাকলে তারা দ্রুত এসে যাবে। অপর দিকে তিনি (সা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকার করেন, মুসলমান বনু যামরাহ্ গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে এবং প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করবে। এই অঙ্গীকার যথারীতি লেখা হয় এবং উভয় পক্ষ এতে স্বাক্ষর করেন। ১৫ দিনের অনুপস্থিতির পর তিনি (সা.) (মদীনায়) ফেরত আসেন। ওয়াদ্দানের যুদ্ধের আরেকটি নাম হচ্ছে আবওয়ার যুদ্ধও বটে। কেননা ওয়াদ্দানের নিকটে আবওয়ার বসতিও রয়েছে আর এই স্থানেই মহনবী (সা.)-এর শ্রদ্ধেয়া মায়ের ইন্তেকাল হয়েছিল। এটিই হচ্ছে সেই স্থান। ঐতিহাসিকরা লিখেন, এই যুদ্ধে মহানবী (সা.) বনু যামরাহ্ র পাশাপাশি মক্কার কুরাইশদের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন। এর অর্থ হলো, তাঁর এ অভিযান মূলত কুরায়েশের ভয়াবহ কার্যক্রমকে বন্ধ করা এবং এর বিষাক্ত ও ভয়াবহ প্রভাবদূর করার উদ্দেশ্যে ছিল যা কুরায়েশদের কাফেলা প্রভৃতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে সৃষ্টি করছিল আর যার ফলে মুসলমানদের অবস্থা সেই সময় ভীষণ স্পর্শকাতর হয়ে উঠছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৩২৭-৩২৮)

যাহোক, হযরত হামযা (রা.) এ যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর পতাকা বহন করেছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে পুনরায় মক্কার কুরায়েশদের কাছ থেকে কোনো সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) মুহাজেরদের একটি দল নিয়ে, যাদের সংখ্যা দেড়শ বা দুইশ বর্ণিত হয়েছে, মদিনা থেকে উশায়রা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং নিজের অনুপস্থিতিতে স্বীয় দুধভাই আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদকে আমীর নিযুক্ত করেন।

এ যুদ্ধেও মহানবী (সা.)-এর সাদা রঙের পতাকা হযরত হামযা (রা.) বহন করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি (সা.) বহু পথ ঘুরে পরিশেষে সমুদ্র তীরের নিকটে ইয়াম্বু -এর পাশে অবস্থিত উশায়রা নামক স্থানে পৌঁছেন। তবে যদিও কুরায়েশদের সাথে যুদ্ধ হয় নি, কিন্তু তিনি (সা.) বনু মুদলেজ গোত্রের সাথে সেসব শর্তে চুক্তি করেন যেসব (শর্তে)বনু যামরা গোত্রের সাথে (চুক্তি) হয়েছিল এবং এরপর তিনি (সা.) ফিরে আসেন।
(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৩২৯) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭)

বদরের যুদ্ধে একক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সম্মুখ সমরের যে উল্লেখ রয়েছে তা বিভিন্ন হাদীসের বরাতে পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে লিখেছেন যে,উভয় বাহিনী যখন সম্পূর্ণভাবে একে অপরের সম্মুখে ছিল তখন আল্লাহ্ তা'লার অদ্ভুত হস্তক্ষেপে তখন সৈন্যদের দাঁড়ানোর বিন্যাস এমন ছিল যে, ইসলামী বাহিনী কুরায়েশদের চোখেআসল সংখ্যার চেয়ে অধিক বরং দ্বিগুণ দেখাচ্ছিল। এর ফলে কাফেররা ভীত হয়ে যায়। কিন্তুঅপরদিকে কুরায়েশদের সৈন্যবাহিনী মুসলমানদের চোখে তাদের প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে স্বল্প দেখাচ্ছিল যার ফলে মুসলমানদের হৃদয় সাহসে পূর্ণ ছিল। কুরায়েশরা কোনোভাবে মুসলিম বাহিনীর আসল সংখ্যা জানার চেষ্টা করছিল যাতে তাদের ছোট হয়ে যাওয়া মনকে আশ্বস্ত করা যায়। এ উদ্দেশ্যে কুরায়েশ নেতারা উমায়ের বিন ওয়াহাবকে প্রেরণ করে যে, ইসলামী সৈন্যবাহিনীর চারিদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেখে আস তাদের সংখ্যা কত? তাদের পিছনে কোনো সাহায্যকারী সেনাদল লুকিয়ে নেই তো? অতএব উমায়ের ঘোড়ায় চড়ে মুসলমানদের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু সে মুসলমানদের চেহারা ও অবয়বের মঝে এমন প্রতাপ, দৃঢ়তা এবং মৃত্যুর প্রতি এরূপ ভ্রুক্ষেপহীনতা দৃষ্টিগোচর হয় যে, সে প্র চণ্ড ভীত হয়ে ফিরে আসে এবং কুরায়েশকে সম্বোধন করে বলে, "যদিও আমি সাহায্যকারী কোনো সেনাবাহিনী দেখতে পাই নি, কিন্তু হে কুরায়েশবাসী! আমি দেখেছি, মুসলমানদের বাহিনীতে উটনীর হাওদাগুলো নিজেদের ওপর মানুষ নয় বরং মৃত লাশ বহন করছে এবং মদীনার উষ্ট্রীগুলোয় যেন মৃত্যু আরোহন করে আছে।"

কুরায়েশরা যখন একথা শুনে তখন তাদের মাঝে এক প্রকার উৎকণ্ঠা ছেয়ে যায়। সুরাকা যে তাদের জামিন হয়ে এসেছিল সে এতটা ভয় পেয়েছিল যে, পালিয়ে ফিরে যায় আর মানুষ তাকে বাধা দিলে সে বলে, "আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা তোমরা দেখছ না।" হাকীম বিন হিযাম উমায়ের-এর মন্তব্য শুনে চিন্তিত হয়ে উতবা বিন রাবিয়ার কাছে এসে বলে, হে উতবা! তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আমর হাযরামী-এর প্রতিশোধই তো চাচ্ছ! সে তোমাদের মিত্র ছিল। এমন কি হতে পারে না যে, তুমি তার পক্ষ থেকে রক্তপণ পরিশোধ করবে আর কুরায়েশদের নিয়ে ফিরে যাবে? এতে চিরকাল তোমার সুনাম থাকবে। উতবা, যে নিজেই উদ্বিগ্ন ছিল (তার) আর কী চাওয়া থাকবে, তাই সে ঝটপট বলে ওঠে, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই সম্মত আছি। সে বলে, দেখো হাকীম! দিনশেষে মুসলমান এবং আমরা পরস্পরের আত্মীয়ও। এটি কি ভালো লাগেযে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে নিবে? তাই তুমি আবুল হাকাম,অর্থাৎ আবু জাহলের কাছে যাও এবং তার সামনে এই প্রস্তাব উপস্থাপন করো। অপরদিকে উতবা স্বয়ং উটে আরোহন করে নিজের পক্ষ থেকেই মানুষকে বোঝাতে আরম্ভ করে যে, আত্মীয়দের সাথে লড়াই করা সমীচীন নয়। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত আর মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উচিত যেন সে অন্যান্য আরব গোত্রের সাথে তার বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে থাকুক, ফলাফল যা হবে দেখা যাবে। এছাড়া এরপর তোমরা দেখবে যে, মুসলমানদের সাথে লড়াই করাও কোনো সহজ কাজ নয়। কেননা অযথাই তোমরা আমাকে কাপুরুষ বলবে, অথচ আমি কাপুরুষ নই। তাদেরকে তো আমার কাছে মৃত্যুর দূত বলে মনে হয়। মহানবী (সা.) দূর থেকে উতবাকে দেখে বলেন, কাফের বাহিনীর মধ্য থেকে কারো মাঝে যদি ভদ্রতা থেকে থাকে তাহলে তা এই লাল উটের আরোহীর মাঝে রয়েছে। তারা যদি তার কথা মেনে নেয় তাহলে তাদের জন্য মঙ্গল হবে। কিন্তু যখন হাকীম বিন হিযাম আবু জাহলের কাছে আসে আর তার কাছে এই প্রস্তাব রাখে তখন উম্মতের সেই ফেরাউন এরূপ প্রস্তাবে কী আর সম্মত হয়? কথা শেষ হতেই সে বলে, আচ্ছা আচ্ছা, উতবা এখন তার সম্মুখে নিজের আত্মীয়দের দেখতে পাচ্ছে। এরপর সে আমর হাযরামির ভাই আমের হাযরামিকে ডেকে বলে, শুনেছ তুমি! তোমার মিত্র উতবা কী বলছে? আর তা-ও তখন যখনকিনা তোমার ভাইয়ের প্রতিশোধ (গ্রহণের সুযোগ) হাতের নাগালে রয়েছে। একথা শুনে আমের ক্রোধে ফেটে পড়ে এবংআরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সে নিজের কাপড় ছিঁ ড়ে নগ্ন হয়ে (একথা বলে) চিৎকার করতে আরম্ভ করে যে, হায় আফসোস! আমার ভাই (তার হত্যার) প্রতিশোধ ছাড়াই রয়ে যাবে। হায় আফসোস!আমার ভাই (তার হত্যার) প্রতিশোধ ছাড়াই রয়ে যাবে। এই মরুভূমির কান্না কুরায়েশ বাহিনীর বক্ষে শত্রুতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত করে এবং যুদ্ধের চুল্লি পূর্ণ উদ্যমে জ্বলে উঠে।"

যাহোক আবু জাহলের টিপ্পনী উতবার পুরো দেহেও আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই ক্রোধে পূর্ণ হয়ে সে তার ভাই শায়বা এবং নিজের পুত্র ওয়ালীদকে সাথে নিয়ে কাফের বাহিনীর সামনে এগিয়ে যায় আর আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী একক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সম্মুখ সমরের আহ্বান জানায়। অতএব আনসাররা তাদের মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, হামজা তুমি ওঠো, আলী তুমি ওঠো, উবায়দা তুমি ওঠো। তারা তিনজনই মহানবী (সা.)-এর একান্ত নিকটাত্মীয় ছিলেন আর তিনি (সা.) চাচ্ছিলেন বিপদসঙ্কু ল স্থানে সবার আগে তাঁর (সা.) আত্মীয়রা যেন অগ্রসর হয়। অপরদিকে উতবা প্রমুখও আনসারদের দেখে বলে ওঠে, এদেরকে আমরা চিনি না, আমাদের সমকক্ষ লোক আমাদের সামনে আসুক। অতএব হমজা, আলী এবং উবায়দা অগ্রসর হন। আরবের রীতি অনুযায়ী প্রথমে পরিচয় হয়। অতঃপর উবায়দা বিন মুত্তালিব ওয়ালীদের মুখোমুখি হন আর হামজা উতবার এবং আলী শায়বার (মুখোমুখি হন)। হামজা এবং আলী একদুটি আঘাতেই নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেন। কিন্তু উবায়দা এবং ওয়ালীদের মাঝে দুচারটি জোরালো আক্রমণ হয় আর অবশেষে উভয়েই একে অপরের হাতে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে যায়। যার ফলে হামজা এবং আলী দ্রুত অগ্রসর হয়ে ওয়ালীদকে হত্যা করেন আর উবায়দাকে নিজেদের তাঁবুতে তুলে নিয়ে আসেন। কিন্তু উবায়দা এই আঘাত থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি আর বদর থেকে ফিরে আসার পথে মৃত্যু বরণ করেন। "
(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৩৫৮-৩৬০)

হযরত হামযা বদরের যুদ্ধে তুয়ায়মা বিন আদী নামক কুরায়েশ নেতাকেও হত্যা করেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব কিস্সাতু গাযওয়াহ বদর)

বদরের যুদ্ধের ঘটনার সময়ের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হামযা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হযরত আলী (রা.)-এর উটনীগুলোকে হত্যা করেছিলেন। এটি মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী বিন হোসেন, বিভিন্ন বর্ণনাকারী রয়েছেন, তার পিতা হোসেন বিন আলী (রা.) -এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধের সময় আমি একটি পূর্ণ বয়স্কা উটনী গনিমত হিসেবে লাভ করি এবং আরেকটি উটনী মহানবী (সা.) আমাকেউপহার দেন। একদিন এক আনসারী সাহাবীর দরজার সামনে এদুটিকে আমি এ চিন্তা করে বেধেরেখেছিলাম যে, এগুলোর পিঠে আসখার (এক ধরণের ঘাস যা স্বর্ণকার জাতীয় লোকেরা ব্যবহার করে থাকে, সুগন্ধি ঘাস) চাপিয়ে নিয়ে যাব। বনু কাইনু কার একজন স্ব র্ণকারও আমার সাথে ছিল। আমি চিন্তা করেছিলাম, এখান থেকে যে আয় হবে তা দিয়ে হযরত ফাতেমা (রা.) যার সাথে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছিলাম তাঁর বৌভাত করব। হামযা বিন আব্দুল মু ত্তালিব (রা.) এই আনসারী সাহাবীর ঘরে মদ্যপান করছিলেন তাদের সাথে একজন গায়িকাও ছিল। সে যখন এই পঙতিটি পড়েযে, হে হামযা! উঠো আর স্বাস্থ্যবান মধ্যবয়সী উটের দিকে অগ্রসর হও। একথা শুনে হযরত হামযা (রা.) নেশার তাড়নায় তরবারি নিয়ে উঠেন এবং দুটি উটনীরই কুঁজ কেটে ফেলেন এবং সেগুলোরপেট চিড়ে কলিজা বের করে নেন।ইবনে জুরায়েদ বর্ণনা করেন, আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করি, কুঁজের মাংসও কি কেটেফেলেছিল। তিনি বলেন, এ দুটির কুঁজও কেটে ফেলেন এবং সেগুলো তিনি নিয়ে যান। ইবনে শিহাববর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, এটি দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তখন তাঁর কাছে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। আমি তঁ াকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত করলে তিনি (সা.) (ঘটনাস্থ লে) আসেন। হযরত যায়েদ (রা.)ও তাঁর সাথেই ছিলেন আর আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)-এর কাছে গিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলে হযরত হামযা (রা.) চোখ তুলে দেখেন। [তিনি (রা.)নেশাগ্র স্থ ছিলেন।] আর মহানবী (সা.)কেও তিনি (রা.) বলেন, তোমরা সবাই আমার পিতৃপু রুষের দাস। ফলে মহানবী (সা.) সেখান থেকে ফিরে চলে

আসেন। এটি মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাসাকাত, হাদীস-২৩৭৫)

তিনি (সা.) বলেন, এ অবস্থায় তার সাথে কথা না বলাই শ্রেয়। কিন্তু দেখুন! পরবতীতে মদ্যপান হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার পর এসব লোক এর ধারে কাছেও ঘেষেন নি। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে এমন ছিল সাহাবীদের মানদণ্ড। তাৎক্ষণিভাবে মদের কলসগুলি ভেঙে ফেলেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস-৫১৩৮)

একথা বলেন নি যে, আমরা ধীরে ধীরে ছেড়ে দিব, যেভাবে বর্তমান যুগের লোক প্রথমে নেশায় পড়ে যায় যা ইসলামের দৃষ্টিতে এমনিতেই খারাপ কাজ এবং নিষিদ্ধ আবার বলবে, ধীরে ধীরে বাদ দিয়ে দিব, আমাদেরকে সময় দেওয়া হোক। যাহোক এটি একটি ঘটনা যা তখনকার (পরিবেশ অনুযায়ী) ছিল, কিন্তু পরবতীতে তাদের কুরবানীর মানও বাড়তে থেকেছে। নিশ্চিতভাবে হযরত হামযা (রা.) পরে কী বলেছেন (তাভেবে) লজ্জিতও হয়ে থাকবেন।

বদরের যুদ্ধের পর যখন বনু কাইনু কার অভিযান সংঘটিত হয়েছিল তখন এতেও হযরত হামযা (রা.) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ যুদ্ধেও মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত হামযা (রা.)-এর হাতেই ছিল। এ পতাকাটি সাদা রঙের ছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮০)

এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন মদীনায় ইহুদিদের তিনটি গোত্র বসবাস করছিল। তাদের নাম হলো বনু কাইনুকা, বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা। মহানবী (সা.) মদীনায় আসার পর পরই এসব গোত্রের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং পরস্পরের সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সাথে বসবাসেন ভিত্তি রচনা করেন। চুক্তির দৃষ্টিকোণথেকে উভয় পক্ষই এ বিষয়ের জিম্মাদার ছিল যে, মদীনায় তারা শান্তি শৃ ঙ্খলা বজায় রাখবে আর যদিকোনো বহিরাগত শত্রু মদীনার ওপর আক্রমণ করে তাহলে সবাই মিলে তাদের প্রতিহত করবে।প্রথম প্রথম ইহুদিরা এই চুক্তি মেনে চলে এবং কমপক্ষে বাহ্যত তারা মুসলমানদের সাথে তারা কোনো বিবাদের সৃষ্টি করে নি। কিন্তু যখন তারা লক্ষ্য করল মুসলমানরা মদীনায় অধিক ক্ষমতাধর হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের আচরণ বদলাতে থাকে। ফলে তারা মুসলমানদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করার সঙ্কল্প করে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা বৈধ-অবৈধ সকল পন্থা অবলম্বন করতে আরম্ভ করে।

এমনকি মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে নি। যেমন- একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, ঘটনাস্থলে অওস ও খাযরাজ গোত্রের অনেক লোক এক স্থানে একত্রে বসে পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে গল্পগুজব করছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক কুচক্রি ইহুদি এই বৈঠকে এসে বু আসের যুদ্ধ প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে। এটি সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ছিল যা হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে এই দুই গোত্রের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল এবং যাতে অওস ও খাযরাজ গোত্রের অনেক লোক একে অপরের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধের কথা উঠতেই কতক আবেগ প্রবণ মানুষের হৃদয়ে পুরোনো স্মৃতি জাগ্রত হয় এবং পুরোনো শত্রুতার চিত্র তাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। এর ফলে যা হয় তা হলো,পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা ও বিদ্রুপের পর্যায় পেরিয়ে বিষয়টি এতদূ র গড়ায় যে, এই বৈঠকেই মুসলমানরাপরস্পরের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে, মহানবী (সা.) সময়মত এ ঘটনাসম্পর্কে অবগত হন এবং মুহাজেরদের একটি দল নিয়ে তিনি (সা.) তাৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হন আর উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করেন। এছাড়া তিনি (সা.) তাদের তিরস্কার করে বলেন, আমার বর্তমানেই তোমরা অজ্ঞতার রীতি অবলম্বন করছ আর খোদার এই নেয়ামতের মুল্যায়ন করছনা যে, ইসলামের মাধ্যমে তিনি তোমদের পরস্পরকে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন? মহানবী (সা.)-এর এই উপদেশের এতটা প্রভাব আনসারদের ওপর পড়ে যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝড়তে থাকেএবং তাদের এই আচরণের জন্য তারা তওবা করে একে অপরকে বুকে জড়িয়ে নেন।

যখন বদরের যুদ্ধ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় মুসলমানদের সংখ্যার স্ব ল্পতা ও তাদের যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বে ও কুরায়েশদের একটি বিরাট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সু স্পষ্ট বিজয় দান করেন আর মক্কার বড় বড় নেতারা ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে মদীনার ইহুদিদের (হৃদয়ে) গুপ্ত বিদ্বেষেরআগুন জ্বলে ওঠে আর তারা মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্যে ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হয় এবং বিভিন্ন সভাসমাবেশে প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে থাকে যে, কুরায়েশ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করাটা কী এমন বড়বিষয় ছিল! আমাদের সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর লড়াই হলে আমরা বুঝিয়ে দিব যুদ্ধ কীভাবে করতে হয়।

এমনকি এক বৈঠকে তারা মহানবী (সা.)-এর মুখের ওপর এধরণের কথা বলে বসে।যেভাবে রেওয়ায়েত রয়েছে, বদরের যুদ্ধের পর মদীনায় ফিরে এসে মহানবী (সা.) একদিনইহুদিদের একত্র করে তাদের উপদেশ প্রদান করেন এবং নিজের দাবির কথা উত্থাপন করে ইসলামগ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁর (সা.) এই শান্তি ও সহানুভূতিপূর্ণ ভাষণের উত্তরে ইহুদি নেতারা বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি হয়তো গুটিকয়েক কুরায়েশকে হত্যা করে দাম্ভি ক হয়ে গিয়েছ। তারা তোযুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। আমাদের সাথে তোমাদের যু দ্ধ হলে তুমি বুঝতে পারবে, যুদ্ধবাজরা এমন হয়! ইহুদিরা শুধু মৌখিক হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, বরং (পরিস্থিতি বিবেচনায়) মনে হয়, তারা মহানবী (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করতে শুরু করেছিল। কেননা রেওয়ায়েত রয়েছে,সেই দিনগুলোতে তালহা বিন বারা নামের একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী মৃত্যুশয্যায় ছিলেন তিনি ওসীয়্যত করেন, আমি যদি রাতের বেলা মারা যাই তাহলে মহানবী (সা.) কে যেন জানাযার নামাযের জন্য অবগত না করা হয়। পাছে এমন কিছু যেন না হয়ে যায় যে, আমার কারণে মহানবী (সা.)-এর ওপর ইহুদিদের পক্ষ থেকে কোনো আক্রমণ হয়ে যায়। মোটকথা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদিরা প্রকাশ্যেদু ষ্কৃতি করতে আরম্ভ করে আর যেহেতু মদীনায় ইহুদিদের মাঝে বানু কাইনুকা গোত্র সবচেয়ে শক্তিধর ও দুর্ধর্ষ ছিল তাই সর্বপ্রথম তাদের পক্ষ থেকেই চুক্তিভঙ্গের সূচনা হয়। কাজেই ঐতিহাসিকরা লিখেছেন ..... মদীনার ইহুদিদের মধ্যে বানু কাইনুকা সর্বপ্রথম এই চুক্তিভঙ্গ করে যা তাদের এবং মহানবী (সা.)-এর মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল আর বদরের যুদ্ধের পর তারা অনেক বেশি বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করে আর প্রকাশ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং তাদের সন্ধি ও চুক্তি ভঙ্গ করে।

কিন্তু এতকিছুর পরও মুসলমানরা আপন মনিবের নির্দেশনাধীনে থেকে সবদিক থেকে ধৈর্যধারণ করে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। বরং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ইহুদিদের সাথে সংঘটিত এই চুক্তির পর মহানবী (সা.) বিশেষভাবে ইহুদিদের মনস্তুষ্টির প্রতি যত্নবান ছিলেন।

যেমন, একবার এক মুসলমান ও এক ইহুদির মাঝে কিছু বাকবিতণ্ডা হয়। সেই ইহুদি হযরত মূসা (আ.)-কে সকল নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। এতে সেই সাহাবী রেগে যান এবং তিনি সেই ইহুদির সাথে কঠোর আচরণ করেন আর মহানবী (সা.)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল বলে উল্লেখ করেন। মহানবী (সা.) যখন এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং সেই সাহাবীকে তিরস্কার করে বলেন, খোদার রসূলদের একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কাজ তোমার নয়। এরপর তিনি (সা.) হযরত মূ সা (আ.)-এর কোনো একটি আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে ইহুদির মনস্তুষ্টি করেন। কিন্তু মনস্তুষ্টির এমন উন্নত আচরণ সত্ত্বেও ইহুদিরা শত্রুতায় আরো বেশি উগ্র হতেথাকে এবং অবশেষে স্বয়ং ইহুদিদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধের উপলক্ষ সৃষ্টি হয় এবং তাদের মনের শত্রুতা ও বিদ্বেষ তারা তাদের বুকে চেপে রাখতে পারে নি আর এটি যেভাবে ঘটেছে তা হলো, এক মুসলিম নারী বাজারে কোনো এক ইহুদির দোকানে কিছু সামগ্রী ক্রয় করতে যায়। কিছু দুষ্ট ইহুদি যারা তখন সে দোকানে বসে ছিল তারা চরম অসভ্যের ন্যায় এই নারীর উত্যক্ত করে। এছাড়া দোকানদার নিজেও যে দুষ্টামি করে তা হলো, সে এই নারীর পেটিকোটের নিচের অংশের কোণা নারীর অজান্তেই কোনো কাঁটা দিয়ে সাথে তার পিঠের কাপড়ের সাথে আটকে দেয়। এর ফলে সেই নারী যখনতাদের উশৃঙ্খল ও অসভ্য আচরণ দেখে সেখান থেকে উঠে চলে যেতে উদ্যত হয় তখন সে নগ্ন হয়ে যায়। এতে সেই ইহুদি দোকানদার এবং তার সঙ্গীসাথিরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আর হাঁসতে থাকে।

মুসলিম নারী লজ্জায় একটি চিৎকার দিয়ে সাহায্যের আহ্বান করে। ঘটনাচক্রে একজন মুসলমান তখন নিকটেই উপস্থিত ছিল। সে দৌড়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছে আর পরস্পর লড়াইয়ে ইহুদি দোকানদার নিহত হয়।

ফলে চতুর্দিক থেকে এই মুসলমানের ওপর তরবারির আঘাত হতে থাকে আর এই আত্মাভিমানী মুসলমান সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করে। মুসলমানরা যখন এ ঘটনা জানতে পারে তখন সাম্প্রদায়িক আত্মাভিমানে তাদের মাঝেও চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আর অপরদিকে ইহুদিরা যারা এ ঘটনাকে যুদ্ধের একটি উসিলা বানাতে চেয়েছিল সমবেতভাবে একত্র হয় আর একটি দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি বনু কাইনুকার নেতৃবর্গকে সমবেত করে বলেন, এমন রীতি ভালো নয়, তোমরা এসব দুষ্টামি থেকে বিরত হও আর খোদাকে ভয় কর। তারা কোনরূপ আফসোস ও অনুতাপ প্রকাশ

না করে এবং ক্ষমাপ্রার্থী না হয়ে উল্টো প্রকাশ্যে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ উত্তর দেয় আর সেই একই হুমকির পুনরাবৃত্তি করে যে, বদরের বিজয়ের বড়াই করো না, আমাদের সাথে যখন মোকাবিলা হবে তখন টের পাবে, যোদ্ধা কাকে বলে? উপায়ন্তর না দেখে তিনি (সা.) সাহাবীদের একদলকে সাথে নিয়ে বনু কাইনুকার দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করেন। তখনো শেষ সুযোগ ছিল, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করার কিন্তু তা না করে তারাও সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়।

মোটকথা, যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে ওঠে আর ইসলাম ও ইহুদিদের শক্তি একে অপরের মুকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়ে।

সেযুগের রীতি অনুসারে যুদ্ধের একটি রীতি ছিল, একপক্ষ নিজেদের দুর্গে সুরক্ষিত বসে থাকতো আর অবরুদ্ধ হয়ে যেত। অপরপক্ষ দুর্গকে অবরোধ করে রাখতো আর এরপর বিচ্ছিন্নভাবে একে অপরের ওপর আক্রমণ করতো, অবশেষে হয় অবরোধকারী সৈন্যরা দুর্গ করায়ত্ব করে নিত বা নিরাশ হয়ে অবরোধ উঠিয়ে নিত বা অবরুদ্ধদের জয় ধরে নেওয়া হতো। কিংবা অবরুদ্ধরা অবরোধের চাপ সহ্য করতে না পেরে দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে নিজেদেরকে বিজয়ীদের হাতে সমর্পন করে দিত। এক্ষেত্রেও বনু কাইনুকা এ রীতিই অবলম্বন করে নিজেদেরকে দুর্গে অবরুদ্ধ করে দুর্গে অবস্থান নেয়। মহানবী (সা.) তাদেরকে অবরোধ করেন আর একটানা ১৫ দিন এ অবরোধ অব্যহত থাকে।

পরিশেষে বনু কাইনুকার সকল শক্তি ও দাম্ভিকতার যখন পতন ঘটে তখন তারা এই শর্তে নিজেদের দুর্গের ফটক খুলে দেয় যে, মুসলমানরা তাদের সম্পদের মালিক হবে ি কন্তু তাদের প্রাণ এবং পরিবার পরিজনের ওপর মুসলমানদের কোনো অধিকার থাকবে না। মহানবী (সা.) এ শর্ত মেনে নেন। এর কারণ হলো যদিও মূসায়ী শরীয়ত অনুযায়ী এরা সবাই হত্যাযোগ্য ছিল আর চুক্তি অনুযায়ী এদের ক্ষেত্রে মূসায়ী শরিয়তের সিদ্ধান্তই প্রয়োগ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এটি যেহেতু এই জাতির প্রথম অপরাধ ছিল আর কৃপা ও দয়ার সাগর মহানবী (সা.) -এর প্রকৃতিও যেহেতু সর্বোচ্চ শাস্তির প্রতি প্রথমেই অগ্রসর হতে পারত না যা শেষ চিকিৎসা হয়ে থাকে আবার অন্যদিকে এমন চুক্তিভঙ্গকারী ও বিদ্বেষপরায়ণ গোত্রের মদীনায় থাকাও আস্তীনে সাপ পোষার নামান্তর ছিল; বিশেষকরে (এমন অবস্থায যখন) অওস ও খাজরায গোত্রের একটি মুনাফিক গোষ্ঠি পূর্ব থেকেই মদীনায় অবস্থান করছিল; অধিকন্তু বাইরের দিক থেকেও সমগ্র আরবের বিরোধিতা মুসলমানদের বিচলতি করে রেখেছিল।

এমতাবস্থায় মহানবী (সা.)-এর এই সিদ্ধান্ত দেয়াই সমুচিত ছিল যে, বনু কাইনুকা মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। এই শাস্তি তাদের অপরাধের বিপরীতে এবং সে যুগের অবস্থার নিরীখে খুবই লঘু শাস্তি ছিল। মূলত এতে আত্মরক্ষার বিষয়টিও দৃষ্টিপটে ছিল। অন্যথায় আরবের বেদুঈন জাতির নিকট বাসস্থান পরিবর্তন করা বড় কোনো কঠিন বিষয় নয়; বিশেষকরে যখন কোনো গোত্রের সহায়সম্পদ জমিজমা ও বাগবাগিচারূপে না হয়, যেমনটি বনু কাইনুকার ছিল না; অধিকন্তু গোত্রের সকল সদস্যের যখন পূর্ণ নিরাপত্তায় এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বসতি গড়ার সুযোগও লাভ হবে। সুতরাং বনু কাইনুকা পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে মদীনা ছেড়ে সিরিয়ার দিকে চলে যায়। তাদের যাত্রা করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধায়ন জাতীয় কাজের দায়িত্ব মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবী উবাদাহ বিন সামেত (রা.)-এর ওপর অর্পন করেছিলেন। তিনি তাদের মিত্র ছিলেন। অতএব উবাদাহ বিন সামেত কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত বনু কাইনুকার সাথে যান এবং পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে সম্মুখে যাত্রা করিয়ে ফিরে আসেন। গণিমতের মাল হিসাবে শুধু যুদ্ধসামগ্রী এবং স্বর্ণকারদের কারিগরী কিছু যন্ত্রপাতি মুসলমানদের হস্তগত হয়।বনু কাইনুকা সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লি খিত রয়েছে যে, যখন তারা তাদের দু র্গের দরজা খুলে নিজেদেরকে মহানবী (সা.)-এর কাছে সমর্পণ করে দেয়। তখন তাদের চুক্তিভঙ্গ, বিদ্রোহ এবং শত্রুতার কারণে তিনি (সা.) তাদের যুদ্ধবাজ পুরুষদের মৃত্যুদন্ড দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের সুপারিশে তিনি (সা.) এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু একথার কোনো প্রমাণ নেই। হাদীস বিশারদরা এই রেওয়ায়েতকে সঠিক মনে করেন না। কেননা অন্যান্য রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের এবং তাদের পরিবার পরিজনের প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার শর্তে রাজি হয়ে বনু কাইনুকা দরজা খুলে দিয়েছিল। তাই মহানবী (সা.) এই শর্ত মেনে নেয়ার পর অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে তাদের হত্যা করার চেষ্টা করবেন- এটা হতেই পারে না। তাই এটি একেবারে ভিত্তিহীন কথা। যদিও বনু কাইনুকার পক্ষ থেকে প্রাণ ভিক্ষার শর্ত উপস্থাপন করা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, তারা নিজেরাও জানত মৃত্যুদন্ডই তাদের প্র কৃত শাস্তি । কিন্তু তারা মহানবী (সা.)-এর নিকট দয়া ভিক্ষা চায়। আর তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না মর্মে প্রতিশ্রুতি নেয়ার পর তারা তাদের দু র্গের ফটক খুলতে চেয়েছিল। কিন্তু যদিও মহানবী (সা.) নিজ দয়ালু প্রকৃতির কারণে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তথাপি বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে এরা তাদের দুষ্কর্ম এবং অপরাধের কারণে ধরাপৃষ্ঠে জীবিত থাকার যোগ্য ছিল না। যেভাবে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, দেশান্তরিত হয়ে এরা যে অঞ্চলে গিয়েছিল সেখানে তাদের এক বছরও অতিবাহিত হয় নি আর তাদের মাঝে এমন এক রোগের সংক্রমণ হয় যাতে পুরো গোত্র এতে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৪৫৭-৪৬১) বনু কাইনুকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৪৬১)

যাহোক হযরত হামযা উক্ত যুদ্ধে পতাকাবাহী ছিলেন।

হযরত হামযা (রা.) ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এ বিষয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এই (শাহাদাতের) সংবাদ পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে প্রদান করেছিলেন।যেভাবে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন, তিনি (সা.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি একটি মেষের পিছু ধাওয়া করছি আর আমার তরবারির ফলা ভেঙে গেছে। আমি এই স্বপ্নের যে তা'বীর করেছি তা হলো, (কাফের) জাতির মেষ বা ভেড়াকে আমি হত্যা করব, অর্থাৎ তাদের সেনাপতিকে (হত্যা করব) আর আমি তরবারির ফলা (ভেঙার) তা'বীর করেছি, আমার বংশের কোনো এক ব্যক্তি (নিহত হবে)। বাস্তবেই হযরত হামযা (রা.) -কে শহীদ করা হয় আর মহানবী (সা.) মুশরেকদের পতাকাবাহী তালহাকে হত্যা করেন।

(মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩৪, হাদীস-৪৮৯৬)

হযরত হামযার 'মুসলা' করা হয়েছিল, চেহারা বিকৃত করা হয়েছিল, নাক-কাট কেটে ফেলা হয়েছিল, তাঁর পেট চিরে ফেলা হয়েছিল। তাঁর এই অবস্থা দেখার পর মহানবী (সা.) খুবই ব্যথিত হন আর বলেন, কুরায়েশের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ আমাকে বিজয় দান করলে আমি তাদের ৩০ ব্যক্তির 'মুসলা' করব। অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) শপথ করে বলেন, আমি তাদের ৭০ব্যক্তির 'মুসলা' করব। এ প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (সূর আন-নাহল: ১২৭)অর্থাৎ তোমরা শাস্তি দিতে চাইলে ঠিক ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে, কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তবে ধৈর্যশীলদের জন্য এটিই উত্তম। ফলে মহানবী (সা.) বলেন, আমি ধৈর্যধারণ করব আর পরবর্তীতে তিনি তাঁর শপথের জন্য কাফফারা আদায় করেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৬)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, বিগত রাতে আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করি [তিনি (সা.) স্বপ্নে একটি দৃশ্য দেখেন] তখন আমি দেখি জা'ফর ফিরিশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে আর অপরদিকে হামযা সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসে আছে।

(মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩২, হাদীস-৪৮৯০)

হযরত আনাস (রা.) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.) ওহুদের দিন হযরত হামযা (রা.) -এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তাঁর নাক ও কান কেটে ফেলা হয়েছিল এবং 'মুসলা' করা হয়েছিল। এটি দেখে তিনি (সা.) বলেন, আমার যদি সাফিয়ার দুঃখবেদনার চিন্তা না থাকতো তাহলে আমি তাঁকে এভাবেই ছেড়ে দিতাম এমনকি আল্লাহ্ তাঁকে পশুপাখির পেট থেকেই উত্থিত করতেন। এরপর তাঁকে (রা.) এক চাদরে কাফন দেওয়া হয়।

(মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩১, হাদীস-৪৮৮৭)

হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদাত ও লাশ দেখে মহানবী (সা.)-এর আবেগের বহিঃপ্রকাশ এবং ধৈর্য ধারণের পরাকাষ্টা প্রদর্শন কেবল নিজেই করেন নি বরং হযরনত হামযা (রা.)-এর বোন এবং নিজ ফুপুকেও এতে বাধ্য করার বিষয়ে পূর্বেও কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছিল। এরপর রয়েছে

যুগ খলীফার বাণী

মোমেনদের জন্য নিজেদের আনুগত্যের মান ক্রমশ উন্নত করা একান্ত আবশ্যক। (খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Ayesha Begum, Harhari, Murshidabad

মাতমকারী আনসারী মহিলাদের মাতম করা থেকে বিরত রাখার ঘটনা। এই ঘটনাটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নিজ খিলাফতের পূর্বের সালানা জলসার এক বক্তৃতায় বর্ণনা করেছিলেন। সেটি আমিও উল্লেখ করছি যেখানে মহানবী (সা.)-এর এই ঘটনা দ্বারা তাঁর মহান চারিত্রিক গুণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। যাহোক, এখানে এটি বর্ণনা করা যথোচিত হবে। পূর্বে তো হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি (রাহে.) বলেন, হযরত হামযা (রা.)-এর প্রতি মহানবী (সা.)-এর যে ভালোবাসা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ এই বাক্যের মাধ্যমে ঘটে যা ওহুদের সন্ধ্যায় মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)-এর শবদেহের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, হে হামযা! আজ আমার যে রাগ হচ্ছে আর তোমার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আমি যে কষ্ট পাচ্ছি আগামীতে আল্লাহ্ কখনোই আমাকে এমন কষ্টের দৃশ্য দেখাবেন না। সেসময় হযরত হামযা (রা.)-এর বোন তাঁর (সা.) ফুপু হযরত সাফিয়া (রা.)ও এ সংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে আসেন। তখন তাঁর (রা.) ধৈর্য্যের বাধ না আবার ভেঙে যায়- এই শঙ্কায় প্রথমে তিনি (সা.) তাঁকে মরদেহ দেখার অনুমতি দেন নি। কিন্তু তিনি (রা.) ধৈর্য ধারণের

প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি (সা.) অনুমতি দিয়ে দেন। যাহোক, তিনি (রা.) হযরত হামযা (রা.)-এর লাশের পাশে এসে উপস্থিত হন আর খোদা ও রসূলের সিংহ নিজ প্রিয় ভাইয়ের মৃতদেহ এ অবস্থায় সামনে পড়ে থাকতে দেখন যে, অত্যাচারীরা বুক চিরে কলিজা বের করে নিয়েছিল এবং মুখাবয়ব পুরোপুরি বিকৃত করে ফেলেছিল। যদিওবা দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল কিন্তু হযরত সাফিয়া (রা.) ধৈর্য ধারণের প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকেন এবং অধৈর্যে র একটি শব্দও মুখ থেকে বের হতে দেন নি। কিন্তু অশ্রু থামানোর ক্ষমতা আছে? ইন্না লিল্লাহ পাঠ করেন এবং কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই বসে পড়েন। অবস্থা এমন ছিল যে, দুঃখভারাক্রান্ত নিরব চোখ থেকে অশ্রুধরা বয়ে চলছিল। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.)ও পাশেই বসে পড়েন। তাঁর (সা.) চোখ থেকেও অবলীলায় অশ্রু বইতে থাকে। হযরত সাফিয়ার (রা.) অশ্রু ঝড়ায় ভাটা পড়লে হুযুর (সা.)-এর অশ্রুতেও ভাটা পড়ত।আবার হযরত সাফিয়া (রা.)-এর অশ্রু ঝড়া বেড়ে গেলে মহানবী (সা.)-এর অশ্রু প্রবাহও বৃদ্ধি পেত। কয়েক মিনিট এভাবেই অতিবাহিত হয়। মহানবী (সা.) এবং আহলে বায়তের শোকপালন এই অল্পক্ষণের নীরব অশ্রু বিসর্জন ছাড়া আর কিছুই ছিল না আর এটাই সুন্নতে নববী (সা.)।

তিনি (সা.) মদীনাতে এমন অবস্থায় প্রবেশ করেন যখন সমস্ত মদীনা শোকের নগরীতে পরিণত হয়েছিল। বাড়ি বাড়ি থেকে ওহুদের শহীদদের স্মরণে বিলাপকারীদের আর্তনাদ উচ্চকিত হচ্ছিল। হুযূর (সা.) শুনে অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে বলেন, হামযার জন্য কাঁদার কেউ নেই। অবশ্য হামযার জন্য কাঁদার কেউ থাকবেই বা কীভাবে? আহলে বায়তকে তো সকাল সন্ধ্যা ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া হতো। হুযূর (সা.)-এর এই বেদনাভরা কথা যখন কিছু আনসার শুনতে পান তখন আবেগাপ্লুত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটে যান আর স্ত্রীদের নির্দেশ দেন, অন্য সবার জন্য বিলাপ করা বাদ দাও এবং হামযা (রা.)-এর জন্য বিলাপ করো। দেখতে দেখতে সবদিক থেকে হামযা (রা.)-এর জন্য আহাজারি ও কান্নাররোল পড়ে যায় আর প্র তি বাড়ি হামযার বিলাপে দুঃখপুরীতে পরিণত হয়। আনসার মহিলারা বিলাপ করতে করতে এবং অশ্রু বিসর্জন দিতে দিতে মহানবী (সা.)-এর বাড়ির সামনে একত্রিত হয়। মহানবী (সা.) শোরগোল শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখেন আনসার মহিলাদের ভিড় লেগে আছে। হুযুর (সা.) তাদের সহানুভূতির জন্য তাদের উদ্দেশ্যে দোয়া করেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু একই সাথে বলেন, মৃতদের জন্য বিলাপ করা বৈধ নয়। অতএব সেদিন থেকে বিলাপ করার প্রথা বন্ধ করা হয়। মহানবী (সা.)-এর পদতলে আমাদের প্রাণ নিবেদীত। কী চমৎকার উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর শিক্ষক ছিলেন যিনি আধ্যাত্মিকতার উর্ধ্বলোক থেকে আমাদেরকে ধর্ম শেখানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। এই উপদেশদাতা কতটা দূরদর্শী ও মেধাবী ছিলেন যার দৃষ্টি মানব প্রকৃতির অতল গহীন পর্যন্ত অবতরণ করত! ওই সময় মহানবী (সা.) যদি আনসার মহিলাদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করতেন যখন তারা নিজেদের শহীদদের বিলাপ করছিল, তাহলে হয়তো কারো কারো জন্য এটি মনকষ্টের কারণ হতো আর এ ধৈর্য ধারণ তাদের জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে যেত। কিন্তু দেখুন! কেমন প্রজ্ঞার সাথে তিনি তাদের বিলাপের মোড় নিজ চাচা হামযা (রা.)-এর দিকে ঘুরিয়েছেন। কিন্তু যখন বিলাপ করতে নিষেধ করেন তখন তিনি নিজ চাচার জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করেন।

আল্লাহর মনোনয়ন তো আল্লাহর মনোনয়নই হয়ে থাকে। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দাদের জন্য কেমন অসাধারণ উপদেশদাতা প্রেরণ করেছেন! যিনি মানব প্রকৃতির সূক্ষ্মতা ও কোমলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন এবং নিজ উম্মতের সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতির প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর এসব মনোরম আচরণ দেখে বুকের মাঝে মন নেচে উঠে এবং মু গ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া হৃদয় থেকে অবলীলায় এ আওয়াজ উঠে যে, আমাদের প্রাণ, আমাদের সম্পদ, আমাদের সন্তানসন্ততি তোমার পদতলে উৎসর্গি ত। হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনার প্রতি লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম। হে সেই সত্তা! যার সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের সমুদ্র ছিল অন্তহীন ও চিরস্থায়ী। হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনার প্রতি লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম। আকাশ ও পৃথিবীর এক-অদ্বিতীয় খোদার কসম! আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টির মাঝে তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তোমার মতো কেউ ছিল না, কেউ নেই এবং কেউ হবেও না।

(খুতবাতে তাহের, খিলাফতের পূর্বে জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ, প্রদত্ত- সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে, পৃ: ৩৬৪-৩৬৬)

হযরত হামযা (রা.)-এর স্মৃতিচারণে মহানবী (সা.)-এর এই উত্তম আদর্শের উল্লেখও হয়ে গেল। এটি এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে।অন্য যে কয়েকজনের স্মৃতিচারণ বাকি আছেন তাদের উল্লেখ ভবিষ্যতে করব ইনশাআল্লাহ্ ।

পরশুদিন থেকে ইনশাআল্লাহ্ নতুন বছর শুরু হতে যাচ্ছে। দোয়া করুন! নতুন বছরের সকল কল্যাণেআল্লাহ্ তা'লা আমাদের কল্যাণমণ্ডিত করুন। জামা'তের জন্যও এটি সব দিক থেকে কল্যাণময়হোক। শত্রুর সকল ষড়যন্ত্র কে আল্লাহ্ তা'লা ধূলিস্যাৎ করে দিন। এছাড়া বিশ্বব্যাপী জামা'তগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের তুলনায় অধিক হারে নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূ রণের সৌভাগ্য দান করুন। একই সাথে বিশ্ববাসীর জন্যও সার্বিকভাবে দোয়া করুন, যুদ্ধবিগ্রহ থেকে আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করুন।

পরিস্থিতি ক্রমান্নয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে আর ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত। কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। সবাই নিজেদের স্বার্থের চিন্তায় ব্যস্ত । আল্লাহ্ তা'লাই দয়া করুন। এছাড়া নিজ অত্যাচারিত ভাইদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আগামী বছর সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার থেকে আহমদীয়া জামা'তকে সুরক্ষিত রাখেন।

****

যুগ খলীফার বাণী

"আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সোপান হল নামায।"

(ফিনল্যাণ্ডে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে, ২০১৯ সাল)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

কর্মহীন থাকার কুফল

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি আল মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

স্মরণ রাখিও! যে জাতির মধ্যে বেকার থাকার রোগ আছে তারা না জাগতিক, ধর্মীয় সম্মানের অধিকারী হতে পারে। বেকার থাকা সংক্রামক ব্যধিতুল্য। যে ব্যক্তি নিষ্কর্মাভাবে বসে থাকে সে কতকগুলি অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথাবার্তা শেখে। সুতরাং বেকারত্ব এমন এক ব্যাধি যে, অঞ্চলে এই ব্যাধি আছে সে স্থানের ধ্বংসের জন্য দ্বিতীয় আর কোনও উপকরণের প্রয়োজন নেই। আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বেকারত্ব অভিশাপ স্বরূপ। যতদূর সম্ভব শীঘ্র এ দূর করা প্রয়োজন। জাতীয় জীভনেও বেকারদের অস্তিত্ব অত্যন্ত বিপজ্জনক। বেকার রোগের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই অপরিহার্য কর্তব্য।

যারা বেকার, তারা যেন বেকার না থাকে। যদি তারা বিদেশে না যায় তবে ছোট খাটো ধরণের যে কাজই জুটুক না কেন তাই যেন করে। তারা পত্র পত্রিকা কিম্বা বই-পুস্তক বিক্রয়ে মনোনিবেশ করুক এবং রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করুক।

আমি চাই জামাতের নৈতিক চারিত্রের মান খুব উন্নত হোক, এবং অপরের নিকট চাওয়ার অভ্যাস তারা ত্যাগ করুক। বেকার জীবন এক অভিশাপ। যত শীঘ্র সম্ভব এর মূলোৎপাটন হওয়া অত্যাবশ্যক। স্মরণ রাখিও, বেকার ব্যাধি দূরীভূত না হলে জামাতের মধ্যে সত্যিকার চরিত্র গঠন সম্ভব নয়।

২ পাতার শেষাংশ.....

কি না সেই চিন্তায় মনের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছিল, তাদের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদা তা'লার ইলহামের অধীনে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে তারা যেন ওসীয়্যত করে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৭০)

যে ব্যক্তি ওসীয়্যত করে খোদা তা'লা মুত্তাকি বানিয়ে দেন

তৃতীয়টি হল ওসীয়তের বিষয়। খোদা তা'লা আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখেছেন। আর এর মাধ্যমে জান্নাতকে আমাদের নিকটবর্তী করে দিয়েছেন। তাই যে সব লোকের মনে ঈমান ও নিষ্ঠা রয়েছে, কিন্তু ওসীয়্যতের বিষয়ে অলসতা প্রদর্শন করছে, আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তারা যেন দ্রুত ওসীয়তের দিকে অগ্রসর হয়। দেখা যায়, এই অলসতার কারণেই বড় বড় নিষ্ঠাবানরা ইহকাল ত্যাগ করে চলে যায়, তাদের গড়িমসি করতে করতে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। তখন মনের মধ্যে আক্ষেপ থেকে যায় যে, যদি এই ব্যক্তিও নিষ্ঠাবানদের সঙ্গে দফন হতেন, কিন্তু তাকে দফন করা যেতে পারে না। সকলের মনে তার মৃত্যুতে একথা উপলব্ধি করতে থাকে যে, সে নিষ্ঠাবান ছিল আর অন্যান্য নিষ্ঠাবানদের সঙ্গে সমাহিত হওয়ার যোগ্য ছিল, কিন্তু তার সামান্য অবহেলা ও উদাসীনতা এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।এছাড়া আমাদের জামাতে এমন মানুষ অনেক আছেন যারা দশমাংশের থেকে বেশি চাঁদা দেয়, কিন্তু ওসীয়্যত করে না। এমন বন্ধুদেরও ওসীয়্যত করা উচিত। বরং এমন ব্যক্তিদের জন্য কোনও সমস্যার বিষয়ই নয়। আরও অনেকে আছেন যারা টাকা পিছু পাঁচ পয়সা বা ছয় পয়সা হারে চাঁদা দেয়, কিন্তু কেবল গাফিলতি তাদেরকে ওসীয়্যত থেকে বঞ্চিত রাখে। মোট কথা সামান্য কিছু টাকার তারতম্যের কারণে আমাদের জামাতের হাজার হাজার মানুষ ওসীয়্যত থেকে বঞ্চিত আছে আর জান্নাতের কাছে থেকেও তাতে প্রবেশ করে না।.....

তাই যতটা সম্ভব ওসীয়্যত করা উচিত আর আমার বিশ্বাস, ওসীয়্যত করলে অবশ্যই ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়। যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ওসীয়্যতকারীদের ঈমানে উন্নতি অবশ্যই হয়।যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে তিনি এই মাটিতে মুত্তাকিদের দফন করবেন, তাই যে ব্যক্তি ওসীয়্যত করে আল্লাহ্ তাকে মুত্তাকি বানিয়ে দেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৩, পৃ: ৫৬৩)

যারা ওসীয়্যত করবে তারা একসময় জান্নাতী না হলেও তাদেরকে জন্নাতি বানিয়ে দেওয়া হবে।

জামাতের সদস্যদেরকে তৃতীয় যে কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটি হল ওসীয়্যতের বিষয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন, ওসীয়্যত ঈমানকে পরীক্ষা করার মাধ্যম। আর এর মাধ্যমে দেখা উচিত যে, কে সত্যিকার মোমেন আর কে নয়। .... ওসীয়্যত এমন এক জিনিস যা নিশ্চিতভাবে খোদার নৈকট্যলাভকে নির্দেশ করে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, মোমেন ব্যক্তিই ওসীয়্যত করে আর এতেও সন্দেহ নেই যে, যদি কোনও ব্যক্তির মাঝে কোনও দুর্বলতা থেকেও থাকে, ওসীয়্যত করলে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে বেহেশতি মাকবারায় কেবল জান্নাতীরা সমাহিত হবে, তাই তিনি তার কর্মের সংশোধন করে দেন। অতএব, ওসীয়্যত হল আত্মসংশোধনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কেননা, যে ব্যক্তিই ওসীয়্যত করবে, সে সেই সময় জান্নাতী না হলেও তাকে জান্নাতী বানিয়ে দেওয়া হবে আর যদি তার কর্ম খুব বেশিই মন্দ থাকে তবে খোদা তার কপটতা স্পষ্ট করে দিয়ে তাকে ওসীয়্যত থেকে পৃথক করে দিবেন।'

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৩, পৃ: ৫৬২)

ওসীয়্যতের উদ্দেশ্যাবলী

যখন ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ হবে, তখন এর দ্বারা কেবল তবলীগের কাজই হবে না,বরং ইসলামের অভিপ্রায় অনুসারে এর থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করা হবে আর দুঃখ ও অভাব-অনটনকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা হবে। ইনশাআল্লাহ। অনাথরা ভিক্ষা করবে না, বিধবারা লোকের সামনে হাত পাতবে না, অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিরা দ্বারে দ্বারে হোঁচট খেয়ে বেড়াবে না। কেননা, ওসীয়্যত শিশুদের মা হবে, যুবকদের পিতা হবে, নারীদের সোহাগ হবে। এবং স্বতস্ফূর্তভাবে ভালবাসে এবং স্বেচ্ছায় এক অপর ভাইয়ের সাহায্য করবে আর আর তার প্রতিদান বিফলে যাবে ন। প্রত্যেক দানকারী খোদার নিকট উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। ধনীরও কোনও ক্ষতি হবে না, দরিদ্রদেরও কোনও ক্ষতি হবে না। এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, বরং এর অনুগ্রহ সমগ্র জাতির উপর বিস্তৃত হবে।

(নিযামে নও, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৬, পৃ: ৬০০)

ওসীয়্যতের সম্পদ সমগ্র জগতের জন্য খরচ করা হবে।

আহমদীয়াতের মাধ্যমে যে অর্থ একত্রিত হবে তা কোনও একটি দেশ বিশেষের জন্য খরচ করা হবে না, বরং সমগ্র বিশ্বের অভাব পীড়িতদের জন্য খরচ করা হবে। সেটা হিন্দুস্তানের দারিদ্রপীড়িত মানুষদেরও

রিপোর্টের শেষাংশ....

কারণও আমার বোধগম্য হয় না। কেননা এই জামাতটি অত্যন্ত স্নেহশীল জামাত, যারা মানুষের আবেগ অনুভূতির বিষয়ে ভীষণ যত্নবান। কারো মনে কোনও প্রকার আশঙ্কা ও উদ্বেগ থাকলেও এই জামাতের জনসেবামূলক এবং আর্ত মানবতার সমৃদ্ধির জন্য সেবামূলক কার্যকলাপ দেখে তা তৎক্ষণাত দূর হয়ে যাওয়া উচিত।

* সাদার্ন মেথোডিস্ট ইউনিভার্সিটিতে পারকিন্স স্কুল অফ থিওলোজি-তে গ্লোবাল থিয়োলোজিকাল এজুকেশনের ডাইরেক্টর ডক্টর রবার্ট হান্ট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন: হুযুর মানবজাতিকে নবীদের ভঙ্গিতে যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ্‌র বিধিনিষেধ মেনে চলে মানুষের প্রতি সদাচারী হওয়াই ইসলামের প্রকৃত অর্থ, মানুষকে খুন করা ইসলামের অর্থ নয়। আর তিনি ইসলামের এই প্রকৃত অর্থই তুলে ধরেছেন।

পুলিসের শীর্ষপদস্থ অফিসার ব্রায়ান হার্ভে বলেন: দশ বছর পূর্বে এলাকার পুলিস প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছিলাম। সেই সময় থেকেই আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।তাঁদের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক রয়েছে আর আমরা পরস্পরের সহযোগিতা করে কাজে আসবে, তেমনি চীন, জাপান, আফ্রিকা, আরব, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইটালি, জার্মানী এবং রাশিয়া প্রভৃতি দেশের গরীবদেরও কাজে আসবে।

(নিযামে নও, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৬, পৃ: ৫৯৩)

ওসীয়্যতকারীরা এক নতুন ব্যবস্থাপনার ভিত্তি স্থাপন করছে।

অতএব, হে বন্ধুরা! যারা ওসীয়্যত করেছেন, মনে রাখবেন! আপনাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের স্থানে ওসীয়্যত করেছেন, তারা নতুন ব্যবস্থাপনার ভিত রচনা করেছে। সেই নতুন ব্যবস্থাপনার যা তার এবং তার পরিবারে নিরাপত্তার ভিত্তিপ্রস্তর।

(নিযামে নও, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৬, পৃ: ৬০১)

আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে অতি শীঘ্র এই আশিসময় ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(মনসুর আহমদ মসরূর)

****

থাকি। আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটির নেতা তাঁর জামাতের সদস্যদের নিজেদের প্রতিবেশী ও সরকার-প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার বিষয়ে ভালভাবে শিখিয়েছেন।

*ইউধি স্লাবিয়াসাক স্থানীয় হাসপাতালে একজন স্পাইন সার্জেন। তিনি বলেন: হুযুরের ভাষণের ব্যাপ্তি এবং অপরের জন্য তাঁর শান্তি ও ভালবাসার বাণী আমাকে অভিভূত করেছে। সমস্ত ধর্মের মানুষকে এক সূত্রে গেঁথে রাখার যোগ্যতা তাঁর আছে।

*জন হপকিন্স ইউনির্ভাসিটিতে রেডিওলোজির অধ্যাপক আতিফ যাহীর সাহেব বলেন: হুযুর আনোয়ার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে এক মঞ্চে সমবেত করেছেন। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মসজিদ কমিউনিটির মানুষদের জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে আর স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে শান্তি ও ভালবাসার আবরণে বেষ্টন করবে। খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি অত্যন্ত উপকারী কথা আমাকে বলেছেন। তিনি স্থানীয় বিষয়াদিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও কথা বলেছেন। (চলবে.....)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞানী।

(আল- আরাফ: ২০১)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita, Bangaingaon (Assam)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর খোদা প্রদত্ত কুরআনের জ্ঞান ও কুরআন সেবা।

-মামুন রশীদ তাবরেজ, নায়েব ইনচার্জ, আহমদীয়াতের ইতিহাস বিভাগ।

মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে ভালভাবে জানতে তার সম্পর্কে গবেষণা করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আমরা যদি কুরআন করীমের কথা বলি তাহলে দেখতে পাই, যারা কুরআনকে ভালবাসার দাবি করে, তারাও নিশ্চয় কুরআন করীমের প্রতিটি অক্ষর নিয়ে প্রণিধান করে এবং তা থেকে খোদা তা'লাকে চেনার পথ খোঁজে। আর এমন ব্যক্তিই কুরআনের সেবা করতে পারে যে কুরআনকে অশেষ ভালবাসে আর যার অন্তর পবিত্র। এটি ব্যতিরেকে কুরআন করীমে লুকানো আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভাণ্ডার খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। একজন কুরআন প্রেমিকের জন্য এটিই একমাত্র মাপদণ্ড আর ইতিহাস সাক্ষী আছে, সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কুরআনের প্রেমিক হিসেবে এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সুধি পাঠকবর্গ! প্রেমিকের জন্য তার প্রেমাস্পদ সর্বোপরি আর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর কুরআনের প্রতি ভালবাসার পরিণামে আমরা তাঁর মাধ্যমে কুরআন করীমের সেই জ্ঞান অর্জন করেছি যা আজ পর্যন্ত মুসলমান জাতির কাছে অজানা ছিল। মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, মুসলেহ মওউদ-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদা মানুষের কাছে প্রকাশিত হবে। আমরা যখন সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর জীবনের দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যে, কুড়ি কিম্বা একুশ বছর বয়সে তিনি কুরআন করীমের দরস দেওয়া আরম্ভ করে দিয়েছিলেন আর তাঁর সামনে বসে যারা দরস শুনতেন তারা ছিলেন সব সম্মানীয় সাহাবা, যাদের মধ্যে অনেকেই কুরআনের জ্ঞানে বিজ্ঞ ছিলেন আর ভারতের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্জন করে এসেছিলেন। এমন সাহাবাদের উপস্থিতিতে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯১০ সালে কুরআন করীমের দরস দেওয়া আরম্ভ করেছিলেন। আর ১৯১৩ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি দিনে দু'বার করে দরস দেওয়া আরম্ভ করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২৩ বছর। তিনি (রা.) ফজর ও জোহরের পর দরস দিতেন।

(সোয়ানেহ ফযলেহ উমর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০১)

১৯১০ সালের ২৯ শে জুলাই তিনি তাঁর জীবনের প্রথম জুমার খুতবা প্রদান করেন। উক্ত খুতবায় তিনি إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ -এর অজানা ও ঈমান উদ্দীপক তফসীর বর্ণনা করেন।

হিন্দুস্তানের স্বনামধন্য আলেম ও সাহিত্যিক মৌলানা আব্দুল মাজেদ দারিয়াবাদী হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সম্পর্কে লেখেন-

"কুরআন এবং কুরআনের জ্ঞানের বিশ্বজনীন প্রসার ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘজীবন তিনি উদ্দীপনা ও সংকল্প নিয়ে যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে তার প্রতিদান দিন। জ্ঞানের দিক থেকে কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব ও মারেফের যে ব্যাখ্যা ও তফসীর তিনি করে গেছেন তা এক উচ্চ মর্যাদা রাখে।"

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৮)

আহমদীদের কাছে তফসীরে কবীর ও তফসীরে সাগীর নামে পরিচিত তাঁর যুগান্তকারী তফসীর অ-আহমদীদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছে। হিন্দুস্তানের খ্যাতনাম আলেম ও সাহিত্যিক আল্লামা নিয়াজ ফতেহপুরী সাহেব তফসীর কবীর অধ্যায়ন করার পর নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন-

"আমার সামনে তফসীরে কবীরের তৃতীয় খণ্ডটি রয়েছে আর আমি সেটিকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করছি। এতে সন্দেহ নেই যে, কুরআন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ এক নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করেছেন। তফসীরটির উস্থাপনায় অভিনবত্ব রয়েছে, যেখানে যুক্তি ও পুঁথিগত বিদ্যার অসাধারণ মিশেল ঘটেছে। তাঁর ,,,,,,,,,,,,, দৃষ্টির গভীরতা, অসাধারণ অন্তদৃষ্টি, যুক্তি উপস্থাপনের পারদর্শীতা এর প্রতিটি শব্দে ফুটে উঠেছে। আমি এতদিন এটি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলাম, এই নিয়ে আমার দুঃখ থেকে গেল। যদি আমি এর সমস্ত খণ্ডগুলি দেখতে পেতাম! গতকাল সূরা হুদ-এর তফসীরে হযরত লুত সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা জেনে আমি হতচকিত হয়েছি আর নিঃসংকোচে এই পত্র লিখতে বাধ্য হলাম। তিনি ,,,,,,,,, -এর তফসীর করার সময় সাধারণ তফসীর লেখকদের থেকে এক ভিন্ন যুক্তির পথ অবলম্বন করেছেন তার প্রশংসা করা আমার জন্য সম্ভব নয়। খোদা তাঁকে সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন দান করুন।"

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৩)

খোদা তা'লা সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (লা.) কে ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কুরআন করীমের জ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে শৈশব থেকেই কুরআনের জ্ঞান শেখাতে শুরু করেছিলেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) নিজে বলেন-

"শৈশবেই আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি আর আমার সামনে এক প্রশস্ত ময়দান রয়েছে। বাসনে ঠোকাঠুকি হলে যেমন শব্দ তৈরী হয়, সেই ময়দানে ঠিক তেমন শব্দ তৈরী হল। সেই শব্দ বাতাবরণে ছড়িয়ে যেতে থাকল আর মনে হচ্ছিল যে, সমস্ত বায়ুমণ্ডলে তা ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর শব্দের মধ্যবর্তী অংশ রূপধারণ করতে শুরু করে। অবশেষে সেই রঙটি উজ্জ্বল হয়ে একটি ছবি হয়ে উঠল। ছবিটি নড়ে উঠে এক জীবন্ত সত্তায় রূপান্তরিত হল। আমি লক্ষ্য করলাম, সেটি একজন ফিরিশতা ছিল। সেই ফিরিশতা আমাকে সম্বোধন করে বলল, আমি কি তোমাকে সূরা ফাতিহার তফসীর শেখাব? আমি বললাম, অবশ্যই শেখান। অতঃপর সেই ফিরিশতা আমাকে সূরা ফাতিহার তফসীর শেখাতে শুরু করে 'ই,, পর্যন্ত পোঁছয়। এই পর্যন্ত পোঁছে সে আমাকে বলল, এতদিন পর্যন্ত যত তফসীর লেখা হয়েছে তা এই আয়াত পর্যন্ত। এর পরের আয়াতের কোনও তফসীর আজ পর্যন্ত লেখা হয় নি। এরপর ফিরিশতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এর পরের আয়াতের তফসীরও তোমাকে শেখাব? আমি সম্মতি জানালে ফিরিশতা আমাকে ..... এবং এরপরের আয়াতগুলির তফসীর শেখাতে শুরু করেন। শেখানে শেষ হলে আমার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে উপলব্ধি করলাম যে, সেই তফসীরের দু-একটি কথা আমার মনে ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম থেকে উঠে বুঝলাম, তফসীরের কোনও অংশ আমার মনে ছিল না। এর কিছুকাল পর একটি মজলিকে এই সূরা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হল আর আমি দেখলাম আমার বুদ্ধিতে এর নতুন নতুন অর্থ অবতীর্ণ হচ্ছে। আর আমি উপলব্ধি করলাম, এটিই ছিল ফিরিশতাদের তফসীর শেখানোর অর্থ। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সব সময় এই সূরার নিত্য নতুন অর্থ আমাকে শেখানো হয়, যার মধ্য থেকে শত শত অর্থ আমি বিভিন্ন পুস্তক ও বক্তব্যে বর্ণনা করেছি। তাসত্ত্বেও সেই ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায় নি।"

(তফসীরে কবীর, সূরা ফাতিহা, পৃ: ৬)

অন্যত্র তিনি বলেন, 'খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহে ফিরিশতাদেরকে আমাকে শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন আর আমাকে কুরআনের সেই অর্থ সম্পর্কে অবগত করেছেন যা কোনও মানুষের কল্পনাতে আসতে পারত না। খোদা তা'লা আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন আর যে আধ্যাত্মিক নির্ঝর আমার বুক থেকে উৎসারিত হয়েছে তা কাল্পনিক ও অবাস্তব নয়। বরং তা এমন নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত যে, আমি সমগ্র জগতকে চ্যালেঞ্জ করছি, যদি এই পৃথিবীর বুকে কোনও ব্যক্তি এমন থাকে যে এই দাবি করে যে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাকে কুরআন শেখানো হয়েছে, তবে আমি যে কোনও সময় তার সঙ্গে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি জানি, আজ পৃথিবীর বুকে আমি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি নেই যাকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কুরআন করীমের জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৮)

খোদা তা'লা তাঁকে কুরআন করীমের যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেছিলেন, তার সঙ্গে তিনি আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীদেরকে কুরআনের তফসীর লেখার প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে বলেন-

"আসুন সামনা সামনি বসে কুরআন করীমের কোনও একটি আয়াতা বা রুকুর তফসীর লিখি আর দেখি যে, কার জন্য খোদা তা'লা মারেফ ও তত্ত্বজ্ঞানের ধারা প্রবাহিত করেন এবং জ্ঞানের সাগর দান করেন। আমি তাদের নিকট অজ্ঞ, স্বল্পজ্ঞানী, শিশু, চাটুকারিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, অনভিজ্ঞ। আমার সঙ্গে মোকাবেলা করা তাদের জন্য এমন কি আর কঠিন বিষয়! তারা কেন বীর বিক্রমে ময়দানে এসে খোদার কিতাবের মাধ্যমে মীমাংসা করে নেয়। আর কেন শকুন ও নেকড়ের মত লুকিয়ে আক্রমণ করে।"

(জলসা সালানা কাদিয়ান, ১৯১৯-এর বক্তব্য)

বিরুদ্ধবাদীরা যখন এ বিষয়ে সম্মত হল না, তখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাদের জন্য আরও সহজসাধ্যতা তৈরী করে বললেন-

'আমিও একাধিক বার চ্যালেঞ্জ

এরপর ১২এর পাতায়....

আহমদী মুবাল্লিগ দলের প্রস্থানের ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য

–আল ফযল পত্রিকা (লন্ডন) থেকে সংগৃহীত

২৪শে মার্চ বেলা ১০টায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) আগ্রায় মোতায়েন আহমদীয়াতের দাওয়াত ও তবলীগ প্রতিনিধি দল ও আমীরের পক্ষ থেকে এই মর্মে তার (টেলিগ্রাম বার্তা) আসে যে, 'আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে আরও কুড়িজন মুবাল্লিগের দরকার।' হুযুর সঙ্গে সঙ্গে কাদিয়ানের প্রত্যেকে ঘরে সংবাদ পাঠিয়ে দেন যে, আহমদী সদস্যরা যেন অবিলম্বে মসজিদে মুবারকে একত্রিত হয়। এই সংবাদ বিদ্যুত গতিতে কাদিয়ানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে আর মুহূর্তের মধ্যে মসজিদ মুবারক আহমদী সদস্যদের ভিড়ে উপচে পড়ছিল। হুযুরকে জানানো হয় যে, খুদ্দামরা উপস্থিত হয়েছে।

হুযুর মজলিস মুশাওয়াত থেকে উঠে মসজিদ মুবারকে আসেন, তাঁর সঙ্গে মজলিসের সমস্ত সদস্যরাও ছিলেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ-র সঙ্গে একগুচ্ছ জরুরী কাগজপত্র ছিল। ইসলামের সেনাপতি এসেছেন, গোটা মসজিদ এমন হয়ে পড়ল যেন সেখানে কেউ নেই। বসে থাকা লোকগুলি যেন মানুষ নয়, মূর্তি।

হুযুর মসজিদের মেহরাবে দাঁড়ালেন। শাহাদত, তৌহিদ এবং এবং কলেমা পাঠের পর সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করলেন এবং ধর্মের জন্য সম্পদ ও সময় ব্যয়ের নসীহত করলেন। তিনি বলেন, ঈমানের ইমারতের পূর্ণতার জন্য নফল আদায় করা আবশ্যক, যেটা মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই বক্তব্যটি পূর্ণত প্রকাশিত হয়েছে আর জামাতের সদস্যরা তা পাঠ করেছে। সব শেষে হুযুর কুড়ি জন খুদ্দামের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। যারা কাদিয়ানের বাইরে সূর্যাস্ত দেখবে।

হুযুরের মুখ নিঃসৃত এই বাক্যের অর্থ বোধগম্য হতেই সমস্ত উপস্থিতবর্গ ভাববিহ্বল হয়ে পড়ে। আর ধর্ম সেবার উৎসাহে তাদের মুখগুলি উজ্জ্বল ওঠে। প্রত্যেকে সেবার কাজে এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা করছিল, আর অভিযাত্রীদের মাঝে নিজেদের নাম দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে বসেছিল। চতুর্দিক থেকে এই আওয়াজ উচ্চকিত হতে শুরু করে। 'হুযুর আমি রাজি, আমাকে পাঠিয়ে দিন, হযরত আমাকে আদেশ করুন, হযরত আমার আবেদন গৃহীত হোক। আপনার দাস হাজির। হুযুর বললেন, যে সব সদস্যরা আবেদন করছেন, তারা নিজের নিজের নাম লিখে দিন। এতে কাগজ ও কলমের খোঁজ পড়ল। কেউ খাতা ছিঁড়ে আনে, কেউ বইয়ের মলাট, কেউ খামের একটি টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে আসে আর তার উপর নিজের নাম লিখছে। কাগজ কম পড়লে একটি কাগজের টুকরোতে দুটি করে নাম লেখা হচ্ছে। যখন এভাবেও উৎসাহ ঠান্ডা হল না, আর কাগজ-কলম শেষ হয়ে গেল, তখন পত্রিকার নীচের অংশে নামের তালিকা দেওয়া হল। কোন পিতা বলে, আমার পুত্র উপস্থিত আছে। বড় ভাই নিজেকে উপস্থাপন করে নিবেদন করে যে, হুযুর আমার ভাইকেও পাঠিয়ে দিন। বলা হয় যে, সে নিজেকে উপস্থাপন করুক। তখন জানানো হয়, 'আমি এখানে আসার সময় তাকে অমুক কাজে নিযুক্ত করে এসেছিলাম। আমি জানি সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, যাওয়ার জন্য প্রত্যেককে নিজেকেই উপস্থাপন করতে হবে। নাম লেখা হয়ে এসেছে। চিরকুটগলি ইমাম সাহেবের হাতে পৌঁছে গেছে। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে নির্দেশ দেওয়া হয় যাদের নাম বলা হচ্ছে সেগুলি লিখে নিতে। হুযুর নাম বলতে থাকেন আর হযরত সাহেবযাদা সাহেব নাম লিখতে থাকেন।

আমরা ২৫শে মার্চ আল ফযল-এর মদনীনাতুল মসীহতে লিখেছি যে, ষাট-সত্তর আবেদন ছিল, কিন্তু এখন গণনা করে জানা গেল সেই দিনই আসরের আগে পর্যন্ত একশ উনিশ জন সদস্য যাওয়ার জন্য নিজেদের নাম উপস্থাপন করেছিলেন। নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা তৈরী হয়ে গেছে। হুযুর বলেন, আমি এখন প্রথমে সেই সব সদস্যদের নাম শোনাচ্ছি যাদের চিরকুট আমার কাছে পৌঁছেছে। তাই সর্বপ্রথম উপস্থাপিত নামগুলি শোনানো হয় এবং সেগুলির মধ্য থেকে যাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছিল সেই কুড়িটিজন সদস্য পৃথক ছিলেন। আর সেই টেলিগ্রাম বার্তা আসার পূর্বেই দুইজন সদস্যকে পাঠানোর প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে গেছিল। তাদের মধ্যে একজন হলেন জনাব মৌলবী চৌধরী মহম্মদ আব্দুস সালাম খান সাহেব কাঠগড়ী, ফাযিল হিন্দু সাহিত্য এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবিত ব্যক্তি ছিলেন পাটিয়ালার মৌলবী আব্দুস সামাদ সাহেব। তিনি সেই সময়ও নাম পেশ করেন আর দলের সঙ্গে তাঁকেও প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এরপর হুযুর সফরকারীদের জন্য দোয়া করেন। প্রস্থানকারীদের জন্য এবং যারা সেখানে আছেন তাদের জন্য। আর তাদের জন্যও যারা কোনও না কোনও কারণে নিজেদের নাম পেশ করেন নি, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও যেন ধর্ম সেবার তৌফিক দান করেন আর তাদের সেবাদানের পথে যে কোনও ধরণের অন্তরায় হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'লা তা যেন দূর করে দেন। দীর্ঘক্ষণ দোয়া হতে থাকে। মজলিস সমাপ্ত হয়। ধর্মসেবার জন্য যাত্রাকারীরা উচ্ছ্বসিত ছিল। আর যারা নাম পেশ করেছিল কিন্তু চাহিদা পূর্ণ হয়ে যাওয়া বা অন্য কোনও কারণে এবার তাদেরকে নির্বাচিত করা হয় নি তারা কিছুটা হতাশ ছিল।

যদিও তারা নিজের ভাগ্যের সিদ্ধান্ত শুনে হতাশ ছিল, কারণ তারা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল না, কিন্তু সেই ভাইদের সৌভাগ্যের জন্য আনন্দিত ছিল, এই ভেবে যে, যারা যাচ্ছে তারা তো তাদেরই ভাই আর তারা যুদ্ধের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েছে। বিদায়গ্রহণকারীদেরকে চতুর্দিক থেকে ধন্য ধন্য করা হচ্ছিল। আলিঙ্গান করা হচ্ছিল। দোয়ার আবেদন করা হচ্ছিল যে যারা যাচ্ছে তাদের জন্য দোয়া কর। যারা এখন যেতে পারে নি, তাদেরকেও যেন খুব শীঘ্র খিদমতের জন্য পাঠানো হয়। যাত্রাকারীরা ইসলাম সেবার নেশায় আচ্ছন্ন ছিল। লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করছিল আর তাদের আনন্দ উথলে উঠছিল, নিজেদের সৌভাগ্য নিয়ে তাদের আনন্দের সীমা ছিল না। এ এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি ছিল। চোখ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে আর হৃদয় এর ছবি এঁকে রেখেছে।

সাধুবাদ ও সালামের কোলাহল থামার পর যাত্রীরা প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে প্রস্থান করে আর দুটোর আগে মসজিদ মুবারকের নীচে একত্রিত হতে শুরু করে। তাদের মধ্যে এমন মানুষও আছে যাদের সফর কুলিদের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাদের সফর উপকরণ খুবই স্বল্প ছিল। নীচে পাতার জন্য কাপড় এবং দু'জোড়া পরনের কাপড়, সেগুলোও আবার বিছানাপত্রের মধ্যে বেঁধে রাখা ছিল। আর ছিল কিছু জরুরী বই-পত্র। তবে অনেকে কুরআন করীমকে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এরই মধ্যে আসরের সময় হয়ে আসে। মসজিদ মুবারক নামাযীতে পূর্ণ হয়ে যায়। ছাদের উপরেও কয়েকটি সারি দাঁড়িয়ে যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) নামায পরিচালনা করেন এবং মসজিদের নীচের মসজিদ চত্বরে কাদিয়ানের মানুষে গমগম করছিল। তারা যাত্রাকারী দলকে কিছুটা এগিয়ে রেখে আসতে চাইছিলেন। ইসলামের সেনাপতি তাঁর প্রিয় খুদ্দামদের বিদায় জানাতে বাড়ি থেকে বের হতেই জনসমুদ্রে যেন একটি ঢেউ খেলে যায়। তিনি সকলের সামনে ছিলেন। তাঁর প্রতি ভালবাসার আবেগ, উচ্ছ্বাস ও নিষ্ঠা এমনই উন্মাদনাপূর্ণ ছিল যে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ার উপক্রম হচ্ছিল। সকলেই নিজেদের ইমামের পাশে থাকার চেষ্টা করছিল। হুযুর যেহেতু দ্রুত পাঁয়ে হাঁটতেন, তাই অন্যদেরকেও দ্রুত চলতে হত, সেই সঙ্গে এই অনবরত প্রত্যেকে এগিয়ে গিয়ে হুযুরের কথা শোনারও চেষ্টা করছিল। তাই ধুলো উড়ে আকাশে মেঘের মত দেখাচ্ছিল। এতে হুযুরের অবশ্যই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তাঁর মহৎ আচরণ দেখুন! তিনি সেই অনুরাগীদেরকে সেভাবে মোটেই দেখেন নি যাতে তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে।

দেড় বা পৌনে দুই মাইল পথ এভাবেই পার হল। পথিমধ্যে হুযুর কিছু উপদেশ দান করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সব উপদেশ মেনে চলার তৌফিক দান করুন।

পথের বাক শেষে কুঁয়োর কাছে সকলে পৌছে গেল। মানুষের একটি বৃত্ত তৈরী হল যার মাঝখানে হুযুর দাঁড়ালেন। সকলকে বসতে বলা হল, যাত্রাকারীদেরকে ডেকে এনে বৃত্তের মাঝে বসানো হল। কাদিয়ানের দিকে মুখ করলে দেখা গেল দূর পর্যন্ত কেবল সাদা পাগড়ির মানুষ চোখে পড়ছে। সকলের একত্রিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা হল। প্রস্থানকারীদের আমীর দলের সদস্যদের উপস্থিতি যাচাই করতে গিয়ে দেখলেন, এখনও তিনজন পিছনে পড়ে আছেন। তাদেরকে উচ্চস্বরে ডাকা হল, তারাও এসে পড়ল এবং সেই বৃত্তের মধ্যে বসে পড়ল। সময় দ্রুত অতিবাহিত হচ্ছিল। বিদায় জানানোর জন্য বাঁকের সেই স্থানটি পর্যন্ত আগমণকারীরা নিরন্তর এসেই

চলেছিল। তাই হুযুর আল্লাহ্‌র প্রশংসাকর্তীন করার পর উপদেশ দিতে শুরু করলেন। উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কথা বলেন এবং বলেন, আলহামদোলিল্লাহ বলার আমরাই বেশি অধিকার রাখি, কেননা আমরা তাঁর ধর্মের সেবার সুযোগ পায়। অতঃপর তিনি অনেক বেশি দোয়া করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, খোদার সাহায্য ছাড়া কোনও কাজে বরকত হয় না, সেই কাজে কল্যাণকর সফলতার নিশ্চয়তাও নেই। তিনি বলেন, তোমরা দুর্বল, কিন্তু শক্তিমানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর যাতে উর্ধ্বলোক থেকে শক্তি লাভ কর। কেননা, আর্য পত্রিকাগুলি এখন ,,,,,,,,,,, হিসেবে একটি নতুন চক্রান্ত (দুরভিসন্ধি) শুরু করেছে। পত্রিকাটি লিখেছে, আহমদীরা সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে উদ্যত হচ্ছে। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, আহমদীরা যে শহরেই রয়েছে, সেখানে তাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এমনকি কয়েক শয়ের বেশি সংখ্যা কোনও শহরেই নেই। সেটাও মাত্র দুই-তিনটি শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আহমদীদের কেন্দ্রভূমি খোদ পাঞ্জাবেও অধিকাংশ শহরে খুব কম সংখ্যক আহমদীদের বাস। আর গ্রামাঞ্চলের কথা বললে, সেখানেও কম বেশি একই পরিস্থিতি। গণনা করা হলে অতি কষ্টে গোট দশেক গ্রাম পাওয়া যাবে যেখানে সমগ্র গ্রামবাসী্রাই আহমদী। আর কুড়ি ত্রিশটি গ্রাম এমন আছে যেখানে গ্রামের অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি মানুষ আহমদী; গ্রামেও আহমদীদের সংখ্যা অন্যান্য জাতির থেকে কম। এর বিপরীতে হিন্দুরা সর্বত্রই সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর ধন-সম্পদের দিক থেকেও তারা শুধু আহমদী নয়, বরং অন্যান্য মুসলমানদের থেকেও ভাল অবস্থায় আছে।

দ্বিতীয়ত, আহমদী জামাত নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমন যার সাথে শত্রু-মিত্র সকলেই পরিচিত। তাদেরকে নৈরাজ্য থেকে বিরত থাকার এবং মন্দের মোকাবেলায় মন্দ না করার শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর খোদা তা'লার অনুগ্রহ, জামাত এর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের কদর্য আচরনের মোকাবেলায় আহমদীরা বিনয় প্রদর্শন করে। তাদের ঢিল খেয়েও হাসি মুখে নম্রভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলে। তাদের গালি শুনে তাদেরকে দোয়া দেয়। এটিই সেই রহস্য যার কারণে আহমদী জামাত দিনরাত উন্নতি করছে। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ করতে থাকবে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) গমনকারীদের কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দান করেন এবং কেউ হাতাহাতি করতে উদ্যত হলে তার থেকে মোকাবেলা না করার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, প্রহৃত হবে কিন্তু হাত তুলবে না। গালি শুনে দোয়া দিবে, কেননা এরই মাঝে তোমাদের সফলতা নিহিত রয়েছে। বক্তব্যের এই অংশটি অত্যন্ত জোরালো এবং বিগলন সৃষ্টিকারী ছিল। শেষে তিনি বলেন, বিদায়গ্রহণকারী প্রিয়জনদের উপহার দেওয়াই রীতি। তোমাদেরকেও উপহার দেওয়ার ইচ্ছে আছে। তাই আমার পরিবার (যার মধ্যে হযরত উম্মুল মোমেনীন এবং হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর দুই কন্যা এবং হযরত ইমামের পরিবার ও প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত) দিয়েছে যা এই প্রিয়জনদের সদকা হিসেবে ভাই আব্দুর রহীম সাহেবের দায়িত্বে দিলাম, আপনি রাস্তায় খয়রাত করবেন আর সেখানকার খয়রাতি চাহিদাতেও খরচ করুন। একথা শুনে সমস্ত সদস্যা অল্প করে হলেও সদকায় অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের হাতে হুযুরকে কিছু না কিছু দিতেন আর হুযুর জাযাকুমুল্লাহ্‌ বলে তা গ্রহণ করতেন আর নিজের হাতে দলের আমীরের আঁচলে দিয়ে দিতেন। কেউ নগদ টাকা, কেউ রুমাল, কেউ টাকার থলি, কেউ চাকু, অনেকে খুরমা উপহার দেয়। আক আহমদী বুজুর্গ মুবাল্লিগদের জন্য তিন-চার সের ওজনের মিষ্টি প্রাতঃরাশ হিসেবে উপস্থাপন করেন। সদকা হিসেবে যে অর্থ একত্রিত হয় তা প্রায় দুশ টাকা ছিল। এরপর হুযুর অভিযাতীদের জন্য দোয়া করেন,সকলের চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল, আর বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড খোদার আরশের সামনে সিজদাবনত ছিল। যে কয়েকজন সদস্য কোনও কারণে যেতে পারে নি, তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিত আর কাঁদত। দোয়ার পর সকলের মনে প্রশান্তি নেমে আসে। ইমাম মহাশয় দলের সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং তাদেরকে বিদায় জানাতে রাস্তায় উঠে আসেন। সদস্যরা রাস্তার উপর অনেক দূর পযন্ত দাঁড়িয়ে পড়েন। গমনকারী দলের সদস্যরা সাধারণ মানুষের সারি থেকে পৃথক কিন্তু ইমামের দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। ইমামের নির্দেশ পেয়ে তারা রওনা হয়ে যায়। সকলে উচ্চস্বরে 'আসসালামো আলাইকুম বলে সফরে রওনা হয়। আল্লাহ্‌র সেনদলের সেনাপতি নিজের ছেলেদেরকে অধীর নয়নে চেয়ে থাকে আর দোয়া করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। তাদের প্রত্যাবর্তনও এভাবেই হয়।যেমনটি প্রথম বার যাওয়ার সময় হয়েছিল, অর্থাৎ চারটি লাইন তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল আর প্রবেশের সময় দুটি লাইন তৈরী করা হয়েছিল।

এটিই সেই জামাত যাকে লোকে কাফের বলে, আর নাউযু বিল্লাহ দাজ্জালের জামাত বলে ডাকে। এমন কোনও জামাতের নজির আছে কি যে দ্বীনের সেবার জন্য এমন উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে এগিয়ে আসে আর তাদের ইমাম এমন ওয়ালিহিয়াত-এর সঙ্গে তাদেরকে ধর্ম সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে? যদি এমন কেউ থাকে তবে পেশ করা হোক। পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করার মত মানুষ অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু এমন মানুষ কোথায় পাওয়া যাবে যাদের মধ্যে প্রত্যেকে এই শর্ত পূরণ করবে যে, তারা নিজেরাও এক পয়সা গ্রহণ করবে না, নিজেদের সন্তানের জন্যও গ্রহণ করবে না। বরং নিজের চাহিদাবলীও নিজেই পূরণ করবে আর নিজ পরিবারের খরচও নিজেই বহন করবে। আর কাজ এমনভাবে করবে যেভাবে একজন ক্রীতদাসও করে না। এর থেকে প্রমাণ হয় না যে, জামাত আহমদীয়া সত্যবাদীদের জামাত। সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা মুতাহি আলাইহিস সালাম।

(আলফযল পত্রিকা, কাদিয়ান দারুল আমান, ২রা এপ্রিল, ১৯২৩, পৃ: ৩)

১০ পাতার পর.....

দিয়েছি যে, চিরকুটে লিখে (কুরআনের) কোনও একটি অংশ নির্ধারণ কর। আর এটা না হলে যে অংশে তোমরা বেশি পারদর্শী, এমনকি একটি অংশ নিয়ে যতদিন চাও চিন্তা-ভাবনা কর, কিন্তু আমাকে বলতে হবে না। এরপর আমার মুখোমুখি হয়ে এর তফসীর লিখ। জগতবাসী তৎক্ষণাৎ চাক্ষুষ করবে যে, জ্ঞানের দরজা আমার জন্য উন্মুক্ত হয় না কি তাদের জন্য। কিন্তু কারো আমার সামনে আসার সাহস কারো হয় না। "

(আলফযল পত্রিকা, ৭ই মার্চ, ১৯৩৮)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি নিয়ে কুরআন করীমের তফসীর বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রায় অসুস্থ থাকতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআনের প্রতি গভীর অনুরাগের কারণেই তিনি (রা.) কুরআন সেবার মহান কীর্তি স্থাপন করেছেন। ধারাবাহিকভাবে তাঁর দেওয়া দরসুল কুরআন সমগ্র তফসীরে কবীর নামে ১০টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তফসীর সাগীর নামে কুরআন করীমের অনুবাদ তাঁর এক মহান কীর্তি। তাঁর কুরআন করীমের তফসীরে এক অভিনবত্ব দেখা যায়। তিনি কুরআন করীমের আয়াত সম্পর্কে পূর্বের মুফাসসিরদের ভ্রান্তিগুলিকে তুলে ধরেছেন আর তফসীর করার সময় অ-মুসলিমদের অভিযোগ ও আপত্তিসমূহকে স্পষ্টরূপে খণ্ডন করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর তফসীরে বিস্তারিতভাবে সূরা এবং আয়াতের বিন্যাস এবং কুরআন করীমের অন্যান্য সূরা ও আয়াতের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সূরা এবং আয়াতের অবতরণের পটভূমি এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্তারিত বর্ণনা এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হওয়ার বিশদ বিবরণ ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিসহকারে উপস্থাপন করেছেন। মোটকথা তাঁর কীর্তি কিয়ামতকাল পর্যন্ত তাঁর মহান সেবা দৃষ্টিপটে মুসলমানদের হৃদয়ে সম্মানের আসনে বসিয়ে রাখবে। প্রত্যেক আহমদীর অন্তর থেকে সর্বদা তাঁর জন্য এই দোয়া উচ্চারিত হবে-

'ধর্মের এই আত্মোৎসর্গকারীর প্রতি খোদা কৃপা করুন।

****

যুগ ইমামের বাণী

আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসরণ না করতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হতো, তা হলেও আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ ও তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না।

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, kolkata

যুগ ইমামের বাণী

অভিশপ্ত ঐ জীবন, যা কেবল দুনিয়ার জন্য এবং হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি যার সকল চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্য।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতঈন)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

শুদ্ধি আন্দোলন এবং মুসলেহ মওউদ সংবলিত ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সম্পর্ক

–হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিষ্ঠাবানদের মুসলমান নেতাদের একাংশের নিকট এই ভয় ধরানো সংবাদ পৌঁছয় যে, নাদওয়াতুল উলেমা এবং আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির আশপাশের কিছু মালকানা রাজপুতদেরকে হিন্দু পণ্ডিত শুদ্ধ করে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করছে। মৌলানা শিবলী নুমানী এই সংবাদ শুনে গভীরভাবে মর্মাহত হন। তিনি তাঁর ক্ষোভ ও দুঃখের কথা এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন–

"আমি এখান থেকে যাওয়ার সময় এমন কোনও গালি নেই যা সেই নাদওয়াপন্থীদের শোনাই নি। বেহায়া! হতভাগারা! ডুবে মর। এই ঘটনা ঘটেছে। নাদওয়াতে আগুন লাগিয়ে দাও আর আলিগড়কেও পুড়িয়ে ফেল। এই কথাগুলিই আমি সেদিন বলেছিলাম আর আজও বলছি। নাদওয়ার যে ছাত্ররা এখানে বসে আছে তারা এর সাক্ষী।"

(হায়াতে শিবলী, পৃ: ৫৫৭, ৫৫৮)

এই অবস্থা থেকে কার্যকরী উপায়ে পরিত্রাণ পেতে তারা ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে লখনউ শহরে সারা ভারতের খ্যাতনামা মুসলমান ব্যক্তিদের একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। আল্লামা শিবলীর জীবনী লেখক মৌলানা সৈয়্যদ সুলেমান নাদবী এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন:

"মৌলানা চাইতেন সমস্ত ফির্কা মিলে ইসলাম প্রচারের কাজ করুক। এই কারণেই এই সম্মেলনে মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (সাহেব), যিনি বর্তমানে কাদিয়ানে অবস্থান করছেন, এবং খাজা কামালুদ্দীন সাহেবের মত ব্যক্তিত্বকে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয় নি। এর ফলে এই সম্মেলন চলাকালেই মৌলানার উপর এই আপত্তি তোলা হয় যে, তারা কাদিয়ানীদেরকে কেন জলসায় অংশগ্রহণ করতে দিয়েছেন? তাদেরকে বক্তব্য রাখার অনুমতি কেন দিয়েছেন?"

(হায়াতে শিবলী, পৃ: ৫৬৯)

মৌলানা শিবলীর উপর এই ঘটনার এতটাই প্রভাব পড়ে যে–

"মৌলানা অসুস্থ এবং বিচলিত হয়ে মৌলবী আব্দুস সালাম সাহেব এবং সীরাতকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। দুই চার মাস চিন্তা–ভাবনার পর ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে নাদওয়া থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আর এই রূপে সমস্ত পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবনা ধরাশায়ী হয়ে যায়।"

(হায়াতে শিবলী, পৃ: ৫৭৩)

এই ঘটনার পর মালকানার হিন্দু পণ্ডিতরা মুসলমানদেরকে 'শুদ্ধ' করার কাজ নিরবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু মুসলমান উলেমারা কাদিয়ানীদেরকে ইসলামী জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে আটকাতে সফল হওয়াকেই বিরাট জয় মনে করছিল আর এই আনন্দে তারা আত্মহারা হয়ে নির্বিকারভাবে হাত গুটিয়ে বসেছিল। সময় অতিবাহিত হতে থাকে। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে ভারতের মুসলমানদের জন্য এক দুর্ভাগ্যপূর্ণ দিন উদিত হল। আর্য সমাজীদের নেতারা নিজেদের বিজয়ের উৎসব উদযাপন করছিল আর ইসলামের ঘোর শত্রু শ্রদ্ধানন্দ অত্যন্ত দর্পভরে এই ঘোষণা করছিল–

'আগ্রার আশপাশের এলাকায় রাজপুতদের অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শুদ্ধ করা হচ্ছে আর এখনও পর্যন্ত চল্লিশ হাজার তিনশ রাজপুত মালকানা, গুজ্জর ও জাট হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। ..... এমন মানুষ ভারতের প্রতিটি এলাকায় পাওয়া যায়। এদের সংখ্যা পঞ্চাশ–ষাট লক্ষের কম হবে না। আর হিন্দু সমাজ যদি এদেরকে নিজেদের মধ্যে সমন্বিত করার কাজ অব্যাহত রাখে, তবে এদের সংখ্যা এক কোটিতে পৌঁছে গেলেও আমি অবাক হব না। "

(প্রতাপ পত্রিকা, লাহোর, ১৬ই মার্চ, ১৯২৩, পৃ: ৪)

এটি শুধু নিছক একটি ঘোষণা ছিল না, একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণ ছিল যা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভারতের বিস্তৃর্ণ ভূমিতে বসবাসকারী মুসলমান সমাজকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। তাদের যখন ঘুম ভাঙল, তখন অন্তর ক্ষতবিক্ষত ও বিদীর্ণ ছিল। হিন্দুরা এই একটি ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং শুদ্ধি আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে রণংদেহী ভাবমূর্তি নিয়ে প্রচারে নেমে পড়ে। যার পরিণামে চতুর্দিকে মুসলমানদের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে যায় আর মুসলমান পত্র–পত্রিকাগুলি অত্যন্ত কার্যকরী ও বেদনাতুর ভাষায় জাতির উলেমা ও অন্যান্য নেতৃবর্গের নিকট এই মর্মে আবেদন করতে শুরু করল যে, তারা যেন নিজেদের পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মতানৈক্য ভুলে ইসলামের সেবায় এগিয়ে আসে আর যে ফির্কা যতটুকু তৌফিক পায় মালকানার মুসলমানদের ধর্মচ্যুত হওয়া থেকে তারা রক্ষা করার চেষ্টা করুক।

এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুসলমান ফির্কার পক্ষ থেকে একাধিক অভিযান শুরু হয় আর লক্ষ লক্ষ রুপি চাঁদা একত্রিত করার আবেদন বিভিন্ন স্থানে ছাপানো শুরু হয়। অনুরূপভাবে জীবন উৎসর্গ করার জন্যও মুজাহিদদের ডাকা হল। শিয়ারা এক ভিন্নধর্মী আন্দোলনের সূচনা করে। তারা নিজেদের মত করে এই ধর্মচ্যুতির ভয়াবহ ধারাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। সেই সময় এক খ্যাতনামা পত্রিকার সম্পাদক নাম ধরে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদকেও আহবান করে। হে ইসলামের সমব্যথী হওয়ার দাবিদার! আজ তুমি কোথায়? আজ ইসলামের জন্য কুরবানীর ময়দান তোমাকে নিজের দিকে আহবান করছে। আজ তোমার এবং তোমার জামাতের দাবির সত্যতা প্রমাণের এটাই সময়। যদিও এই আহ্বানের এক মাস পূর্বেই অর্থাৎ ১৯২৩ সালের ৭ই মার্চ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এই বিষয় নিয়েই জামাতের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, জামাত যাবতীয় প্রকারের ত্যাগস্বীকারের জন্য যেন প্রস্তুত থাকে আর একটি এমন এক স্কীমের বিষয়েও বলেন যা তিনি পূর্বাহ্নেই ধর্মচ্যুতির ফিতনাকে প্রতিহত করার জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। কিন্তু অমৃতসরের উকিল পত্রিকার এই আহ্বানে ঈমানী আত্মাভিমান প্রদর্শন পূর্বক তিনি তৎক্ষণাৎ ৯ই মার্চে একটি ইশতেহারের মাধ্যমে এর উত্তর লেখেন এবং আহলে ইসলামকে এ বিষয়ে পূর্বের প্রয়াস সম্পর্কে অবগত করলেন। এছাড়া তিনি ভারতের মুসলমানদেরকে এই কাজের জন্য ২০ লক্ষ টাকা চাঁদা একত্রিত করার প্রস্তাব দিলেন এবং বললেন, সমস্ত ফির্কা পৃথক পৃথকভাবে নিজের অংশের টাকা নিজেরাই একত্রিত করুক আর নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থাপনার অধীনে খরচ করুক। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ফির্কার অধীনে মুজাহিদীনদের পৃথক পৃথক দল এই সম্মিলিত দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাক। তিনি বলেন, যদিও সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে ২০ লক্ষের মধ্যে অন্যান্য মুসলমানদের তুলনায় জামাত আহমদীয়ার অংশ মাত্র ১৬০ ভাগের একাংশ। অর্থাৎ মাত্রা তেরো হাজার টাকা, কিন্তু নিম্নোক্ত দুটি বিষয়কে দৃষ্টিতে রাখা হলে এই কুরবানীতে জামাতের অংশীদারি আরও কম নির্ধারিত হওয়া উচিত।

প্রথম, জামাতে কোটিপতি তো দূরের কথা লাখপতিও নেই। অথচ অন্যান্য সমস্ত মুসলমান ফির্কাদের মধ্যে বহু সংখ্যা কোটিপতি বা লাখপতি রয়েছে।

দ্বিতীয়: অতি সম্প্রতি জামাত আহমদীয়ার নারীরা ইসলাম সেবার এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ বার্লিনে মসজিদ নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছে। আর এই মুহূর্তে তারা সেই দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন আছে।

তথাপি উক্ত দুটি কারণ সত্ত্বেও হযরত ইমাম জামাত আহমদীয়া সংকল্প করেছেন, তেরো হাজার টাকার থেকে কম না করে জামাতের নিষ্ঠা এবং ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টিপটে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা একত্রিত করার ঘোষণা করেছেন যা ইসলামের পক্ষে শুদ্ধি আন্দোলনের অভিমুখ পরিবর্তনের জন্য খরচ করা হবে।

যে সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ ধর্মচ্যুতির ফিতনা প্রতিহত করার জন্য জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেই সময় সার্বিকভাবে জামাতের আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করা সমীচীন হবে, যাতে এই প্রতিশ্রুতি কোন মানের ছিল তা কিছুটা অনুমান করা যায়। বর্তমানের মাপকাঠিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা এতটাই সাধারণ ব্যপার যে জামাতে আহমদীয়ার বহু এমন সদস্য পেয়ে যাবেন যারা ব্যক্তিগতভাবেই এর থেকে অনেক বেশি অর্থ ধর্মের সেবার জন্য উপস্থাপন করতে পারেন এবং করে আসছেন। কিন্তু সেই সময়কার পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। প্রথম, সেই সময় এবং তখনকার টাকার মূল্যমানের আকাশ–পাতাল পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, জামাতের আর্থিক অবস্থাও সেই সময় অত্যন্ত অস্বচ্ছল ছিল আর উপার্জনের পথও অত্যন্ত স্বল্প ও সীমিত ছিল।

শুদ্ধি আন্দোলনের মাত্র এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯২২ সালের পরামর্শ সভার রিপোর্টের উপর দৃষ্টি দিলে জানা যায় যে, জামাত আহমদীয়া যে আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণ কিভাবে পাওয়া সম্ভব, একটি চিন্তন শিবিরে সেই উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত নীতি প্রণয়নের জন্য বিষয়টি

উপস্থাপিত হয়। আঞ্জুমানের দৈন্যদশা এতটাই প্রকট ছিল যে, কর্মীদের বেতন দেওয়ার মতও অর্থ ছিল না। কর্মীদের মাসের পর মাস বেতন আঞ্জুমানের উপর ঋণ হিসেবে চেপে ছিল। আর আঞ্জুমানে ঋণ হ্রাস হওয়ার পরিবর্তে নিত্যদিন ভয়াবহ গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জামাত নিদারুন অর্থসংকট এবং অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও যে ইসলামের যে বিশ্বজনীন বিজয় সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল, তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা মেটানো দূরের কথা, জামাতের তুচ্ছ তুচ্ছ চাহিদা পূরণ করতেও অসমর্থ ছিল। আহমদী মুবাল্লিগীন অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছিল। বিদেশে মুবাল্লিগরা অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা ও ওষুধ-পত্রের জন্য অর্থ ছিল না। এই আর্থিক সংকটের সময় জামাত আহমদীয়ার বাৎসরিক বাজেট তৈরী হয় আর যারপরনায় হিসেব সংকোচন করে বাজেট প্রস্তুত করা সত্ত্বেও জামাতকে যে যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছি সে বিষয়ের উল্লেখ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) মজলিসে শুরায় তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন বলেন-

"আরও একটি কমিটি নিযুক্ত করি যা আরও তিন-চার হাজার বাজেট হ্রাস করে। বাজেট কমিয়ে দেওয়া হল, ছেলেদের ভাতার পরিমাণও কমিয়ে দেওয়া হল, এতটাই, যার নীচে আর কম করা সম্ভব ছিল না। আর বাইরের কর্মীরা যে বেতন পায়, আমাদের কর্মীরা তার থেকে অনেক কম বেতন পায়। কিন্তু এখন তাদের বেতন আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দারিদ্রপীড়িতদের জীবন রক্ষার জন্য যাদেরকে দুর্ভিক্ষ ভাতা দেওয়া হত সেটা বন্ধ করা হয় নি, বরং যাদের বেতন ৬০-এর বেশি ছিল তাদের পনেরো শতাংশ এবং যাদের বেতন ১০০-এর উপর ছিল তাদেরকে কুড়ি শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। আমি বললাম, তাদের ত্যাগস্বীকার করা উচিত আর তারা সকলে সানন্দে তা মেনে নিয়েছে। যদিও আমাদের কর্মীরা কম বেতন পায় অপরদিকে সরকার কর্মীদের বেতন দ্বিগুণ-তিনগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আরও হ্রাস করেছি। তবে বোঝা হ্রাস পেলেও এখনও পর্যন্ত কয়েক মাসের বকেয়া আছে। প্রথমে তিন মাসের বেতন বকেয়া ছিল, এখন সেটা পাঁচ মাসের হয়েছে। অবস্থা এতটাই সঙ্গীন যে, যেহেতু তারা (কর্মীরা) ঋণ নিয়ে সংসার ব্যায় নির্বাহ করেছে, তাই দোকানগুলি দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম দেখা দিয়েছে। এদিকে পাঁচ মাসের বেতন পাওয়া যায় নি, অন্যদিকে দোকানের পুঁজি নেই... অবস্থা এমন যে অনেকেই নাগাড়ে অনাহার যাপন করছেন। এখনই এক ব্যক্তি বলল, 'আমার পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করছিল যে অভুক্ত ছিল। আমি তার মুখ দেখে বুঝে ফেলি, আর সত্যিই সে কয়েকদিন ধরে অভুক্ত ছিল।' সে তাকে কিছু দিল, কিন্তু পথেই অন্য একজনকে তার থেকে অর্ধেক দিয়ে দিল। তেমনি বর্ণনা অন্য একজনের বিষয়েও শুনলাম, সে অনাহারে থাকার কারণে জ্ঞান হারিয়েছে, আমি তাকে বাড়ি থেকে খাবার পাঠায় আর বলে পাঠায় তাকে যেন খাইয়ে দিয়ে আসে। আমি মনে করি, এখানে অনেক নিষ্ঠাবান রয়েছে যারা অনাহারে মারা যাবে, তবু কাজ ছেড়ে দিবে না। কিন্তু এমন কর্মীরা যদি অনাহারে মারা যায়, সেটা কি আমাদের জামাতের জন্য কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে না? বলার অর্থ, আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে (জামাতের জন্য)এটা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ সময়।"

(রিপোর্ট, মজলিস মুশাবিরাত, ১৯২২, পৃ: ১৮-১৯)

এহেন পরিস্থিতিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) জামাত আহমদীয়ার নারীদের সামনে বার্লিনে মসজিদ নির্মাণের স্কীম উপস্থাপন করেন। তিনি জামাতের নিকট স্পষ্ট করেন যে, আমরা নিজেদের আর্থিক সংকটকে ধর্মীয় প্রয়োজনের পথে অন্তরায় হতে দিব না। তিনি তাদেরকে বলেন, আজ জার্মানীতে ইসলামের সেবার এক নতুন ও বিস্তৃত ময়দান উন্মুক্ত রয়েছে যার চাহিদাবলীকে কোনও মূল্যেই উপেক্ষা করা যায় না। বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান জাতির জন্য মনোস্তাত্ত্বিকভাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা বেশি উজ্জ্বল বলে প্রতিভাত হচ্ছে। যদিও জামাত আগে থেকেই ঘোর আর্থিক সংকটে আচ্ছন্ন, কিন্তু তিনি সেই বিষয়ের পরোয়া না করে বার্লিনের মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদার আহবান জানান। আর আহমদী নারীদেরকে একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে তারা যেন বার্লিনে মসজিদ নির্মাণের জন্য ৫০ হাজার টাকা শুধু মাত্র নিজেদের কাছ থেকে উপস্থাপন করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়, স্বামীদের কাছে যেন না চায়। স্বামীদের কাছে চাইতে এজন্য নিষেধ করা হয়েছিল যে, বস্তুত জামাতের পুরুষদের জন্য সেই সময় এর চেয়ে বেশি আর আর্থিক বোঝা সহন করার শক্তি ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। আর নারীদের কাছে প্রত্যাশা কেবল এতটুকুই ছিল যে, তারা নিজেদের সঞ্চয় এবং গয়না বিক্রি করে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করে দিতে পারবে। এমনটিই হল, কিন্তু এটি একটি পৃথক বর্ণনা যার কিছুটা উল্লেখ যথাসময়ে করা হবে। আপাতত, এর উল্লেখমাত্র করে ক্ষান্ত হতে হল, কারণ, পাঠক যাতে অনুমাণ করতে পারে যে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) মালকানার জিহাদের জন্য যে জামাতের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দেওয়ার আহ্বান করেন, সেই জামাত কিরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল আর এই চাওয়া কতটা মূলবান ছিল, এর মর্যাদা কি ছিল। এই দুটি চাওয়া একদিকে যেমন তাঁর দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরে, তেমনি একথারও সাক্ষ্য দেয় যে, প্রিয় প্রভু আল্লাহ্‌র কৃপা ও সাহায্যের উপর তাঁর অসাধারণ ঈমান ও আস্থা ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এগুলি খোদা তা'লারই কাজ, তিনিই এগুলি পূর্ণ করার উপকরণ সৃষ্টি করবেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে, জগতবাসী বিস্ময়কর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করল। ক্ষুধা জর্জরিত এই জামাত ইসলামের চাহিদাকে নিজেদের চাহিদার উপর প্রাধান্য দিল আর সমধিক উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতার সাথে ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দিল। সিঃসন্দেহে এটি খোদার অনুগ্রহ ছিল, কিন্তু সেই অনুগ্রহরাজি মাহমুদের মাধ্যমে প্রকাশিত হল। জামাতকে খোদা তা'লা এমন মহান নেতা দান করলেন, যিনি ইসলামের সেবার জন্য এই আত্মোৎসর্গকারীদের রক্তের প্রতিটি বিন্দু নিংড়ে উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুত ছিল। তিনি এমন এক নেতা ছিলেন যিনি কুরবানীর প্রতিটি ময়দানে নিজে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং পরে জামাতকে নিজের পিছনে এগিয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর ভূমিকায় এক বিস্ময়কর উচ্চ মর্যাদা ছিল, তাঁর কথায় ছিল জাদু। যখন সে কুরবানগাহের দিকে জামাতকে আহ্বান করে, তখন মনের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভুতির সৃষ্টি হয়, সেবার উদ্দীপনায় হৃদয় বিদীর্ণ হতে চায় এবং মহম্মদের দ্বীনের জন্য উৎসর্গিত হওয়ার জন্য প্রবলভাবে স্পন্দিত হতে শুরু করে। পাগলপারা জামাত তাঁর পিছনে ধাবিত হয় আর প্রত্যেক আহমদী একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। দুর্বলরা পড়ে গিয়েও কোনও পতে পা টেনে টেনে কুরবানগাহের দিকে অগ্রসর হয় আর যারা পঙ্গু ও অসহায় ছিল, তারা অস্ফুট স্বরে এই বেদনাদায়ক সংগীত গাইছিল-

'সৌভাগ্যবান তারা, যারা এই মজলিসে কোনও ক্রমে পৌঁছে গেছে, কখনও উদ্যম বেগে ধাবমান থেকেছে, কখনও কোথাও একটু আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আমার বন্ধুরা! কিন্তু সেই নিষ্প্রাণসঙ্গীদের কি উপায়! যাদের করুণ আর্তনাদ বাতাসে ভেসে গেছে, আর্তি বিফলে গেছে।"

যেভাবে তিনি (রা.) এই আন্দোলনকে জামাতে আহমদীয়ার মাঝে পরিচালনা করেছেন এবং আর্য সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুষ্টিমেয় আত্মোৎসর্গকারীদেরকে এক বিচিত্র ঈমানীয় মর্যাদায় সুসজ্জিত করেছেন, তার উপাখ্যান আহমদীয়াতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সর্বপ্রথম তিনি যথারীতি একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং তাৎক্ষনিকভাবে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য কয়েকজন মেধাবী ও শিক্ষিত যুবককে ম্যালকানা অঞ্চলে রওনা করেন। এর পর কিছু খুতবা এবং বক্তব্যের মাধ্যমে জামাতকে এই বিষয়টি চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত করেন এবং সমস্যাবলী সম্পর্কে সতর্ক করেন। তিনি তাদের নিকট এ বিষয়টি ভালভাবে স্পষ্ট করেন যে, একটি অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে যা সংখ্যা ও সম্পদের বিচারে এতটাই বিশাল যে, জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতে আহমদীয়ার সঙ্গে তাদের কোনও তুলনায় হয় না। এরপর তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমান যোদ্ধাদের সুমহান কুরবানীর স্মৃতি উস্কে দিয়ে তাদের মনে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেন যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিজেদের সর্বস্ব ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তাদের আবেগ ও উদ্দীপনাকে অযথা রাস্তায় বল্গাহীন হতে দেন নি আর প্রদর্শন ও বিক্ষোভ আকারে তাদের ফুটতে থাকা উত্তেজনাকে বিনষ্ট হওয়ার অনুমতি দেন নি। কাদিয়ানের অলিতে গলিতে উচ্চস্বরে নারা ধ্বনি মুখরিত হয় নি আর আর্য সমাজের বিরুদ্ধে গালিগালাজ দেওয়ার কোনও অভিযান চালানো হয় নি। তবে সমষ্টিগতভাবে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে একটি নিরবিচ্ছিন্ন কর্মধারার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সর্বপ্রথম তিনি জামাতের মনোযোগ দোয়ার অভিমুখে ঘুরিয়ে দেন এবং তাদের নিকট ভালভাবে স্পষ্ট করে দেন যে, দোয়া ছাড়া পরিণামবাহী কাজ দূরে থাক, কাজ করার তৌফিকও লাভ হওয়া সম্ভব নয়। ফলে, জামাতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নিজেদের সামর্থ অনুসারে দোয়ায়

রত হয়। রাত্রিতে প্রত্যেক আহমদীর ঘর থেকে খোদার দরবারে আকুল ক্রন্দনের কলরব ভেসে আসতে শুরু করল, আহমদীরা খোদার দরবারে জেগে থেকেই রাত্রি যাপন শুরু করল। তাহাজ্জুদে নতশির হয়ে ইসলামের বিজয়েরর জন্য দোয়া করা হতে থাকল আর আল্লাহ্ ধর্মের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য আগুয়ানরা আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য ও সমর্থনের ভিক্ষা যাচনা শুরু করল।

দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের পর তিনি (রা.) জামাতকে ধন-সম্পদ ও প্রাণের কুরবানী করার প্রতি আহ্বান করেন এবং এই পথে সম্ভাব্য বাধা-বিঘ্ন সম্পর্কে সম্যক রূপে সতর্ক করলেন। যাবতীয় প্রকারের বিপদ চিহ্নিত করেন এবং তাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে দেন যে, এপথে অত্যন্ত কঠিন সময় আসবে, অনেক সময় অনাহারে থাকতে হবে, কখনও রৌদ্রদগ্ধ হতে হবে আবার কখনও প্রচণ্ড শীতে নগ্ন পায়ে হেঁটে যেতে হবে, কখনও পুরাতন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করতে হবে, কখনও নিজের সাজসরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যেতে হবে আবার কখনও অপরের বোঝা কাঁধে তুলে নিতে হবে আর এভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস সময় অতিক্রান্ত করতে হবে। ফকিরদের ন্যায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে নিজেদের পথহারা ভাইয়েদের পুনরায় ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে। গালি শুনে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, প্রস্তুত হয়ে দোয়া দিতে হবে। ওষুধ ছাড়াই সকল প্রকারের রোগব্যাধির মোকাবালা করতে হবে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হবে। স্ত্রী-সন্তান এবং বাড়ির সুখ-স্বাচ্ছন্দের ভাবনাকে মন থেকে বের দিতে হবে। এই সব কিছু স্পষ্ট করে দেওয়ার পর তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে, যদি তোমাদের মাঝে ইসলামের সেবার জন্য এই সমস্ত কুরবানীর পথে অগ্রসর হওয়ার উদ্যম তাকে, তবে আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি, খোদা তা'লা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন আর পৃথিবীর কোনও শক্তি তাদের বাহ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব, ধন-সম্পদ এবং সংখ্যা বল সত্ত্বেও তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। তোমরা খোদার প্রিয়ভাজন হয়ে উঠবে। আর দ্বীন ও দুনিয়ার উৎকৃষ্ট নেয়ামত এবং আশিসসমূহ তোমাদের ভাগ্যে জুটবে।

তিনি (রা.) জামাতের কাছে এমন দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী এবং অবিচল যোদ্ধাদের চাইলেন যারা বিপদ ও সংকটের অতল গভীরে নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। তিনি প্রথমেই তাদেরকে সতর্ক করেন যে, তোমরা কেবল বাইরের শত্রুদেরই সম্মুখীন হবে না, তোমাদের ভাইয়েদের মধ্য থেকে মুসলমান নামে পরিচিতি উলেমারা তোমাদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজির অভিযান চালাবে। এইরূপে তোমাদের সামনেও এবং পশ্চাতেও শত্রু থাকবে আর চতুর্দিক থেকে তোমাদের উপর আক্রমণ করা হবে। তোমাদেরকে কাফের বিধর্মী এবং দাজ্জাল নামে ডাকা হবে আর বলা হবে যে, মালকানাবাসীদের জন্য আহমদীদের তবলীগে ইসলাম কবুল করার চেয়ে ধর্মচ্যুত হয়ে আর্য, ব্রহ্মসমাজী কিম্বা খৃষ্টান হওয়া শত গুণে শ্রেয়। কিন্তু কোনও আহমদীর মাধ্যমে কলেমা তৌহিদের স্বীকারুক্তি করবেন না। একদিকে তিনি (রা.) যেমন জাগতিক বিপদাপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, অপরদিকে খোদার মহত্ব ও প্রতাপের চিত্রও এমনভাবে এঁকে দেন যে, হৃদয় খোদাভীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় আর পার্থিব জীবন এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ সম্পর্কে মন বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর খুতবা শ্রবণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি এবং তাঁর লেখনী অধ্যয়নকারী প্রত্যেক পাঠক স্বেচ্ছায় এবং ভক্তিভরে ত্যাগ-তিতিক্ষার স্পৃহা নিয়ে নিজেদের জীবন এবং সর্বস্ব উৎসর্গ করার মানসিকতা নিয়ে উপস্থিত হত।

সেই সময় তিনি জামাতের কাছে যে মহান আর্থিক কুরবানীর প্রত্যাশা করতেন এবং যে চরম পদক্ষেপের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন সেকথা অনুমান করা যায় হযরত শেখ মহম্মদ আহমদ সাহেব মাযহার বি.এল.এল.বি-এর একটি রেওয়ায়েত থেকে যা নিম্নে বর্ণিত হল। হযরত শেখ সাহেব বলেন:

'১৯২৩ সালের মজলিসে মুশাওয়ারাত-এ আমি উপস্থিত ছিলাম। হুযুর শুদ্ধির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আর এক স্থানে একথাও বলেন যে, যদি আর্য জাতি নিজেদের ধন-সম্পদের বলে শুদ্ধি (আন্দোলন) কে সফল করতে চায়, তবে আমার অনুমান, বর্তমানে আমার জামাতের মোট সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক দুই কোটি টাকা হবে- আমর জামাত এই সব সম্পত্তি এই শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিসর্জন দিতে মোটেই কুণ্ঠিত হবে না। জামাত সানন্দে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করবে এমন দৃঢ় প্রত্যয় হুযুরের দৃঢ় সংকল্প এবং জামাতের এমন তরবীয়তের প্রমাাণ। পরের ঘটনাক্রম 'সামি'না ও আতা'না অনুযায়ী এই আনুগত্যেকেই প্রমাণ করে। হুযুরের বক্তব্যের সেই এই বাক্যগুলি কোথা প্রকাশিত হয়েছিল কি না তা আমার জানা নেই, কিন্তু আমার ভালভাবে স্মরণ আছে এবং অনেক স্থানে বন্ধু ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সামনে একথার উল্লেখ করে এসেছি। ১৯২৩ সালের পরামর্শ সভার পর আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও শুদ্ধিদের এলাকায় কাজ করার তৌফিক দান করেন।"

সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সফল নেতা সেই ব্যক্তিই হয়, যে বুদ্ধি ও আবেগের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখে। তিনি সেই সময় এই ভারসাম্যকে এমনভাবে বজায় রাখেন যে, প্রত্যেকটি শ্রোতা তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে এবং নারা ধ্বনি উচ্চকিত করতে শুরু করে। একদিকে তিনি এমন উৎকৃষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনা জামাতের সামনে তুলে ধরেন যা জামাতের জন্য সুসংহত কর্মসূচি উপস্থাপন করত এবং সহজাত আবেগ ও কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারা থেকে মুক্ত, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। এটি ছিল এক প্রকার সেচ ব্যবস্থা সদৃশ ব্যবস্থাপনা যা অনেক চিন্তাভাবনা, পরিশ্রম ও তথ্য দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে যেভাবে সর্বত্র সেচের জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা জালের মত বিন্যস্ত থাকে আর পানির প্রতিটি বিন্দু ফসল ফলাতে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে তাঁর আবেগ মিশ্রিত বজ্রকণ্ঠ শ্রোতাদেরকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করত করল যে, প্রত্যেকের বুকে কুরবানীর উন্মদনার ঢেউ উথলে উঠল। অতঃপর তিনি নিয়ম-শৃঙ্খলার এক বিশাল বাঁধ বেঁধে দিয়ে এমনভাবে রক্ষা করলেন যে, প্লাবনের সময় তারা ডুবে না গিয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবাহে বহমান হয়ে যে ভূমির দিকেই প্রবাহিত হয়ে, সেখানেই নতুন জীবনের সঞ্চার করে। যদিও আবেগের উন্মাদনা এতটাই উচ্চাঙ্গের ছিল যে, তিনি চাইলে হাজার হাজার নিষ্ঠাবানদেরকে শুদ্ধির লড়াইয়ে ঠেলে দিতেন, কিন্তু তিনি জানতেন যে, এতে লাভের থেকে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। আর এতে কিছু সময়ের মধ্যেই জাতি সমস্ত শক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়বে। তাই তিনি প্রাথমিকভাবে দেড়শ মুজাহেদের প্রস্তাব দেন। যদিও কিছু সময়ের মধ্যে দেড় হাজারের কাছাকাছি যুবক ও প্রবীণদের দল নিজেদেরকে উপস্থাপন করে, কিন্তু তিনি অতি সতর্কতার সাথে পরিস্থিতির দাবি অনুসারে তাদের মধ্যে থেকে মনোনীত করে বিভিন্ন দলে বিভিক্ত করেন, এবং তাদের দলের একজন করে আমীর নিযুক্ত করেন যাতে তারা নিজেদের এলাকায় থেকে কর্তব্য পালন করে। তাদের সকলের উপর মাননীয় চৌধুরী ফতেহ মহম্মদ সাহেব সিয়াল (রা.)কে আমীর নিযুক্ত করা হয়। যে সব নীতিগত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার সারমর্ম এই যে, সর্বাবস্থায় আমীরের আনুগত্য অনিবার্য হবে, প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করতে হবে, কঠোর পরীক্ষা সত্ত্বেও বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলতে হবে। প্রহৃত হয়েও হাতাহাতি করার অনুমতি থাকবে না। অন্ততপক্ষে তিন মাসের জন্য ওয়াকফ করতে হবে। আর এই সময়ে যাবতীয় খরচ নিজেদেরকেই বহন করতে হবে। এলাকার বাসিন্দাদের উপর কোনও প্রকার আর্থিক বা ব্যক্তিগত পর্যায়ের কোনও বোঝা চাপানোর অনুমতি থাকবে না। খাবার না পাওয়া গেলে ছোলা চিবিয়ে প্রাণ রক্ষা করে হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে চেয়ে খাওয়ার চিন্তা মাথাতেও যেন না আসে। কেবল মৌখিক উপদেশ দান করলেই চলবে না, যতদূর সম্ভব এলাকার দুঃস্থ ও অভাবীদের খেয়াল রাখতে হবে এবং তাদের সাহায্য করতে হবে। এই নীতিগত নির্দেশনার মশাল নিয়ে যতগুলি দল এই অভিযানে বের হয়েছে সকলেই নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছে আর আত্মত্যাগের এমন অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে যে, প্রাথমিক যুগের মসলমানদের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে।

যদিও মুজাহেদীনরা একশ শতাংশ খরচ নিজেরাই বহন করেছে, কিন্তু এই সব খরচ ছাড়াও মুজাহিদীনকে কর্মক্ষেত্রে নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে হত, মরকযী ব্যবস্থাপনার চাহিদার জন্য বই-পুস্তক প্রকাশ এবং জগতকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে এবং প্রয়োজনের সময় মুকাদ্দমা চালানো এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য এক বিশাল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল। এই কারণেই তিনি (রা.) জামাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দেওয়ার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামাতের সদস্যরা বিস্ময়কর কুরবানী প্রদর্শন করেছে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই চাহিদা পূরণ করে মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করেছে। সেই সময় এই আর্থিক কুরবানীর আহ্বান এত বড় চাওয়া হিসেবে মনে করা হত যে, ভারতের অ-আহমদী এবং অমুসলিম সংবাদ মাধ্যমেরও এ বিষয়টি গোচরে আসে। তারা একথা ভেবে আশ্চর্য হয় যে, এই ছোট্ট জামাতটি এত বড় চাহিদা আদৌ কি পূরণ করতে পারবে?

নিঃসন্দেহে সেই সময় জামাতের অবস্থা দৃষ্টিপটে রেখে বলা যায়, এটা অনেক বিশাল চাওয়া ছিল। একজন সাধারণ চিন্তাধারার মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না , এই ক্ষুদ্র ও দারিদ্রপীড়িত জামাতটি এতবড় কুরবানী দিতে পারে। কিন্তু জগতবাসী অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখেছিল যে, জামাত সর্বোতভাবে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। শুধু কুরবানীই পেশ করে নি, বরং তা এমন মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে, নিষ্ঠা ও ঈমানীয় আবেগ নিয়ে পেশ করেছে যে, সেকথা উল্লেখ মাত্র আজও চোখ ছলছল করে ওঠে। আর হৃদয়ের গভীর থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে সেই সব মোজাহেদদের জন্য দোয়া বের হয়। আল ফযল, ১৫ই মার্চ, ১৯২৩ এর সংখ্যায় এক বয়োবৃদ্ধ পিতার ভাবাবেগপূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ করা হল-

'১০ই মার্চ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) আসরের নামারে পর মসজিদে আবির্ভূত হলে এক বয়োবৃদ্ধ রাজমিস্ত্রী ক্বারী নঈমুদ্দীন সাহেব বাঙ্গালী কিছু নিবেদন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি পেলে বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে এক ভাবাবেগপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ক্বারী সাহেব বলেন-

'যদি আমার ছেলে (মৌলবী) যিললুর রহমান ও মুতীউর রহমান (বি.এ. ক্লাসের ছাত্র) আমাকে বলে নি, কিন্তু আমার অনুমান, হুযুর কালকে রাজপুতানায় গিয়ে তবলীগ করার জন্য জীবন ওয়াফ করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং যে পরিস্থিতিতে সেখানে থাকার শর্ত উপস্থাপন করেছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা যদি হুযুরের নিকট নিজেদের উপস্থাপন করে তবে আমি একজন বৃদ্ধ পিতা হওয়ায় আমার কষ্ট হবে বলে তিনি মনে করছেন। কিন্তু আমি হুযুরের সামনে খোদাকে সাক্ষী করে বলছি, তাদের যাওয়াতে এবং কষ্ট ভোগ করতে বিন্দু মাত্র দুঃখ নেই। আমি স্পষ্টভাবে বলছি, এরা দুজনে যদি খোদার পথে সেবারত অবস্থায় মৃত্যুও বরণ করে, তবে আমি তাদের জন্য একফোটা চোখের জলও ফেলব না, বরং খোদার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। শুধু এরা দুজনকেই নয়, আমার তৃতীয় পুত্র মেহবুবুর রহমানও যদি ইসলামের সেবা করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে আর আমার দশজন পুত্র থাকে ও তারাও মৃত্যু বরণ করে, তবুও আমি শোক জ্ঞাপন করব না। হয়তো এমন ভাবনাও হতে পারে যে, ছেলের কষ্টে আনন্দিত হওয়া এমন কিছু না। অনেকে এমন রোগব্যধিতে আক্রান্ত হয় যে, তারা নিকটজনের মৃত্যুতে আনন্দিত হয়। কিন্তু আমি বলি, যদি আমি নিজেও খোদার পথে মৃত্যু বরণ করি তবে আমার জন্য আনন্দেরই কারণ হবে।

আমি জানি প্রদর্শনকামীতা ধ্বংস হওয়া পথ। তাই আমি হুযুরের নিকট আবেদন করছি, আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমার মনকে প্রদর্শনমুখিতা ও লৌকিকতা থেকে রক্ষা করে, কেননা তা ঈমানের জন্য বিষ স্বরূপ। আর আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে নিষ্ঠা দান করেন। বাঙ্গালীদের অন্তর অতটা কঠিন নয়, কিন্তু মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর ঈমান আনার কারণে আমাদের অন্তর শক্তিশালী হয়েছে আর ঈমান আমাদের দুর্বলতা দূর করে দিয়েছে।"

(আখবার, ১৫ই মার্চ, ১৯২৩, পৃ: ১১)

এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যাদের কাছে দেওয়ার মত কিছু ছিল না, তারা নিজেদের ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি কিম্বা সর্বস্ব বিক্রি করে এই জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। ডক্টর মঞ্জুর আহমদ সাহেবের কাছে শুধু একটি মোষ ছিল, সেটিই তিনি জলের দরে বিক্রি করে দেন। লোকসান করলেও তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করে একথার উল্লেখ করে বলতেন, ভাগ্যিস সেই সময় তিনি গ্রাহক পেয়েছিলেন। অনেক দরিদ্র মানুষ চিঠি লিখে অনুমতি প্রার্থনা করেন যে, যাতে যা কিছু তাদের কাছে আছে তা বিক্রি করে পাথেয় সংগ্রহ করেন এবং জিহাদের ময়দানে পোঁছে যান। ফিরোজপুরের এক অভাব পীড়িত সদস্য আলি শের সাহেব হুযুরের কাছে এই মর্মে পত্র লেখেন যে,

'আপনার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। আমি একজন দরিদ্র মানুষ। হুযুরের শর্ত শিরোধার্য করতে সমর্থ নই, যার জন্য আমি দুঃখিত। আমার উপর চল্লিশ টাকা ঋণ আছে, কিন্তু নিজের বাড়ি আছে। আপনার আদেশ হলে সেটিকে বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে জিহাদের ময়দানে শিঘ্রই চলে যাব।

বিনীত, আলি শের, যেরা ফিরোজপুর"

(কারেযার শুদ্ধি, প্রণেতা- মাস্টার মহম্মদ শফী সাহেব আসলাম, পৃ: ৪৫)

জামাতের মহিলাদের উপর বার্লিন মসজিদের চাঁদার দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যেও উৎসাহ ও উদ্যমের ঘাটতি ছিল না। তারা মালকানার বোনেদের জন্য তারা নিজেদের পরনের কাপড় পর্যন্ত পাঠিয়েছে। ছোট মেয়েরাও এই পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণ করছিল। আমার বোন আমাতুল কাইয়ুম বেগম, যে আমার খালাতো ভাই পাকিস্তানের সাবেক অর্থমন্ত্রী এম.এম. আহমদ-এর পত্নী, সেই সময় তার বয়স ছিল ছয় বছর। তিনিও সেই সময় ছোট্ট একটি দোপাট্টা উপস্থাপন করেন যাতে মালকানার কোনও ছোট বোনকে দেওয়া যায়। অন্যান্য আহমদী বালিকারাও এই ধরণের কাজ করেছে। ছোটরা নিজেদের মধ্যে মালকানাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। ধন-সম্পদ দিয়ে মোজাহেদদের সাহায্য করার মাধ্যমে জিহাদ করাই কেবল আহমদী মহিলাদের বাসনা ছিল না, বরং তারা নিজেরাও ছটপট করছিল যাতে কোনভাবে যুদ্ধের ময়দানে পোঁছে গিয়ে এই মহান ইসলামী জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে। উমর বিবি নামে এক বোন আগ্রা থেকে হুযুরকে লেখেন-

"হুযুর আমি কুরআন মজীদ জানি, কিছুটা উর্দু জানি। আমার ছেলের কাছে শুনেছি, মুসলমানরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ছে আর হুযুর সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আদেশ হলে আমিও এক্ষুনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিব, বিন্দুমাত্র বিলম্ব করব না। খোদার নামে শপথ করে বলছি, আমি যাবতীয় কষ্ট সহন করার জন্য প্রস্তুত।"

(কারেযার শুদ্ধি, পৃ: ৪৬)

আমাতুর রহমান সাহেব মিড ওয়াইফ ভেরওয়া হাসপাতাল- তিনি নিজের আবেগ অনুভুতির কথা জানিয়ে লেখেন-

'হুযুর আমার পিতা মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রেমিক ছিলেন। তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। আমার দুই ভাই আব্দুর রহীম ও আব্দুল্লাহ্ জিহাদীদের সঙ্গে হুযুরের নির্দেশে কাজ করছে। এই অধমের মনও ছটপট করছে। আমিও তিন মাসের জন্য জীবন উৎসর্গ করছি।"

(কারেযার শুদ্ধি, পৃ: ৪৬-৪৭)

শুদ্ধি আন্দোলনের সময় জামাত আহমদীয়া যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে আর এই আন্দোলনে প্রভাবিত ইউপির কয়েকটি জেলায় যে সাফল্যের সঙ্গে আর্য সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিটি ময়দানে তাদের পর্যদুস্ত করেছে তার বর্ণনা দীর্ঘ। আর এটা আহমদীয়াতের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়। আর জামাতের ইতিহাসে এর উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আমাদের দৃষ্টি এখন এই আন্দোলনের সেই দিকগুলির প্রতি যার সম্পর্ক সরাসরি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর ভূমিকা এবং যোগ্যতার সঙ্গে।

যতদূর এ বিষয়টির সম্পর্ক যে, তিনি (রা.) একজন বিজয়ী সেনাপতি রূপে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে আর প্রতিটি ময়দানে সফল হয়েছে, এ সম্পর্কে পরবর্তীতে কিছুটা বর্ণনা করা হবে। আপাতত কেবল এতটুকু না বললেই নয় যে, খিলাফত আন্দোলনের সময় তাঁর ভূমিকায় যে পার্থক্য ছিল তা এটাই যে, যদিও তিনি তখন যথাসময়ে সতর্কবাণী ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করেন, কিন্তু পরিস্থিতি এমন ছিল যে, বাস্তবে সংগ্রামের ময়দানে একজন সফল সেনাপতি হিসেবে মুসলিম জাতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে ওঠে নি। শুদ্ধি আন্দোলন তাঁকে সেই সুযোগ দিয়েছিল। নিজের পরামর্শসমূহের যথার্থতা ও মূল্যকে বাস্তবের মাটিতে সঠিক প্রমাণ করে দেখানোর সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দিয়েছিলেন। জগতবাসী উদ্বেগের সাথে দেখেছে সাধারণ মানুষের ভাবাবেগ ও উন্মাদনাকে বিদ্রুপে পাত্রে পরিণত হতে। সেই সময় তাঁর নেতৃত্ব ক্ষমতার আর একটা দিক উন্মোচিত হয়েছিল। সেটি এই যে, এমন সংকটময় মুহূর্তে যখন কিনা জামাতের ভয়াবহ আর্থিক অস্বচ্ছলতার শিকার ছিল, তখন তিনি জামাতের উপর আরও বেশি খরচের বোঝা চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি, বরং তিনি একের পর এক এমন সব আর্থিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তাদেরকে আহ্বান করতে থেকেছেন যা আপাত দৃষ্টিতে পূর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রতিভাত হত। সেই জামাত যা কমীদের মাসিক বেতন দেওয়ার সামর্থ রাখত না, তাদের মহিলাদের কাছ থেকেই পঞ্চাশ হাজারের মত বিশাল পরিমাণ টাকা চাঁদা চাওয়া এবং তিষ্ঠিতে না দিয়ে আরও পঞ্চাশ হাজারের চাঁদা দানের আহ্বান করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় সাহসিকতার কাজ ছিল। বাহ্য দৃষ্টিতে এর পরিণাম বের হওয়া উচিত ছিল জামাত সেই চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হত, আর ভবিষ্যতে চাঁদা দিতে গড়িমসি করত। কিন্তু বাস্তবে হল ঠিক এর উল্টোটা। পরবর্তী কালের পরিস্থিতি প্রমাণ করে দেয়ে যে, বস্তুত, সেই সময়েই জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ভিত মজবুত হয়েছে। আর সংকটকালে এই দুটি আর্থিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের আহ্বানের ফলে এবং এর কল্যাণে জামাতে আর্থিক ত্যাগস্বীকারের ক্ষমতা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে। নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার

হয়েছে, জামাতের উদ্যম আরও ব্যপকতা লাভ করেছে এবং জামাত সমষ্টিগতভাবে আর্থিক ত্যাগস্বীকারে এমন সুউচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করেছে যা দেখে সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম এর আশিসময় যুগ ছাড়া পৃথিবীর বুকে এর দৃষ্টান্ত দেখা যাবে না।

সারসংক্ষেপ এই যে, বস্তুত, ১৯২৩ সালেই মালকানাদের জিহাদ এবং বার্লিন মসজিদের চাঁদার আহবানের কল্যাণে জামাতে আহমদীয়া প্রথম বার আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুদৃঢ় হয়েছে এবং এমন আমূল পরিবর্তন এসেছে যেন জনসমক্ষে এক নতুন জামাত রূপে আত্ম প্রকাশ করেছে।

শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অন্যান্য মুসলমানরাও যদিও কিছুটা কাজ করেছে, কিন্তু জামাত আহমদীয়ারর জন্য এটা ছিল এক চূড়ান্ত যুদ্ধ। এটা আর্য সমাজ ও হিন্দুমতের পুনর্জাগরণের দেশব্যাপী এক শক্তিশালী আন্দোলন ছিল যারা বিশেষ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সংকল্প করেছিল। অপরদিকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জামাত আহমদীয়া ছাড়া এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত কেউ ছিল না। জামাতে আহমদীয়ার মত তেমন কেউ সসংগঠিত ছিল না, আর এমন বা-খোদা. সুচিন্তক নেতাও ছিল না। নিজেদের অর্থ ও সম্পদ একত্রিত করে সেটিকে কাজে লাগানোর ক্ষমতাও কারো ছিল না। না ছিল কোন সংগঠন, কোনও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা, আর না ছিল কাজ করার পদ্ধতি। কোন কাজকে স্থায়ীভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। জামাত আহমদীয়াই একমাত্র মুসলিম ফির্কা ছিল যে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্ব ইসলামের প্রতিনিধি করার সুযোগ পেয়েছে আর প্রতিটি মোকাবেলায় শত্রুদেরকে পর্যদুস্ত করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শত্রুরা বিফল হয়ে ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

এই সব কিছু হয়েছে, কিন্তু কারো মনে এই চিন্তা উঁকি দেয় নি যে, প্রকৃতপক্ষে এটি সেই লড়াইয়েরই নতুন রূপ যা এক দীর্ঘ সময় পূর্বে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ মওউদ (আ.) বনাম আর্য সমাজের নেতা পণ্ডিত লেখরামের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। সেই সময় কে বলতে পারত যে, লেখরাম অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে যে প্রতিশ্রুত সন্তানের বিরুদ্ধে এমন কদর্য ভবিষ্যদ্বাণী করছে, একদিন তার স্বজাতিই সেই সন্তানের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জয়ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে? যে সময় লেখরাম ঘোষণা করছিল, আর্য সমাজের খোদা তাকে জানিয়েছে যে, এই সন্তানের জন্ম নিলেও তিন বছরের মধ্যে তার নামচিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলা হবে। কাদিয়ানের বাইরে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া দুরস্ত, কাদিয়ানেই তার নামে কেউ তাকে চিনবে না। কে বলতে পরত যে, সেই ছেলেটিই একদিন আর্য সমাজের বিরুদ্ধে কুরআন রূপী তরবারি নিয়ে এমন বীরদর্পে বের হবে যে, চতুর্দিকে তার নামের জয়ধ্বনি মুখরিত হবে আর আর্য সমাজীরা নিজেরাই একথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, সেই মহান নেতার নেতৃত্বে আহমদীয়াত আন্দোলন আর্য সমাজের জন্য এমন এক বিপদ যার মুখোমুখি হলে ধ্বংস অনিবার্য। সেই সময় কে বলতে পারত যে, যে সন্তানের বিষয়ে দাবি করা হচ্ছে যে, সে নাকি নিজের গ্রামেও অখ্যাত হয়ে থাকবে, সে অচিরেই শুধু একটি গ্রাম, জেলা, বা রাজ্য নয় বরং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে খ্যাতি লাভ করবে। আর ভবিষ্যত বক্তার অনুসারীরা নিজেরাই তাঁর খ্যাতির কারণ হবে। এই ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, যদিও ভারতের মুসলমানরা হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদের সঙ্গে শুদ্ধি আন্দোলনের পূর্বেও পরিচিত ছিল। কিন্তু ভারতে বসবাসকারী অধিকাংশ হিন্দু তাঁর সম্পর্কে অনবহিত ছিল। এমনকি জামাত আহমদীয়ার নামও তারা জানত না। শুদ্ধি আন্দোলনই দেশব্যাপী খ্যাতির প্রথম সোপান সাব্যস্ত হয়, যে-সোপান বেয়ে তাঁর খ্যাতি শীর্ষে পৌঁছে যায় আর শত্রুরাও তাঁর মহান নেতৃত্বকে কুর্নিশ জানাতে বাধ্য হয়।

শুদ্ধি আন্দোলন এই দৃষ্টিকোণ থেকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নের তথ্য উপস্থাপন করে যে, হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ-এর জন্মের পূর্বে আর্য সমাজ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মাঝে এক চূড়ান্ত বিতণ্ডা বাধে। সেই সময় দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানদের উলেমা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে আর্য সমাজীদের সঙ্গ দিচ্ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, তখন আর্যসমাজীদের পক্ষ থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি নিয়ে কোনও কদর্য ও তীর্যক মন্তব্য করা হলেই মুসলমান উলেমারা আর্য সমাজীদের সঙ্গে মিলে তাঁকে উপহাস করেছে। লেখরাম যখনই কোনও আস্ফালন করেছে তখন মুসলমান উলেমাদের অট্টহাসি সব থেকে বেশি করে শোনা গিয়েছে। তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে যখনই পত্র-পত্রিকায় কদর্যকর কিছু প্রবন্ধ ছেপেছে, মুসলমান সাংবাদিকদেরকে তার সমর্থনে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা গেছে। আর এমন প্রত্যেক বারই ভারতেই পরিমণ্ডলে আর্যদের পক্ষ থেকেও এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকেও এই ধ্বনি উচ্চকিত হয়েছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) মির্যা কাদিয়ানীর ভবিষ্যদ্বণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় অন্য কিছু ছিল, এমন সময় আসা নির্ধারিত ছিল যখন সেই প্রতিশ্রুত পুত্রের হাতে পরাস্ত হয়ে আর্যরাও অব্যক্ত কণ্ঠে একথা সাক্ষী দেওয়ার ছিল যে, লেখরাম তার প্রতিটি কথায় মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছে আর মির্যা গোলাম আহমদ তাঁর প্রতিটি কথায় সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছে আর মুসলমান নেতাদেরও এই প্রতিশ্রুতি পুত্রের সমর্থনে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা দেওয়ার ছিল যে, ইসলামের এই পরাক্রমশালী;;;;;;;; প্রত্যেক যুদ্ধের ময়াদনে আর্য শত্রুদের পরাস্ত করেছে আর লেখরামের ধর্মের লাঞ্ছনা এবং অপদস্ততা সেই পুত্রের হাতেই হয়েছে যার ধ্বংস হওয়ার অপূর্ণ বাসনা নিয়ে যার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে জমীনদার পত্রিকা ১৯২৩ সালের ২৪ শে জুনের প্রকাশনায় লেখে-

'ধর্মত্যাগের ফিতনা পরিস্থিতির বিষয়ে যা কিছু পত্র-পত্রিকা থেকে জানা গেছে, তা থেকে স্পষ্ট যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে জামাত আহমদীয়া অমূল্য সেবা করছে। তাদের পক্ষ থেকে যে আত্মত্যাগ, একাগ্রতা, সদিচ্ছা এবং আল্লাহ্‌র উপর আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা বর্তমান যুগে হিন্দুস্তানের বুকে বিরল না হলেও নিঃসন্দেহে সম্মান ও সমাদর পাওয়ার যোগ্য। একদিকে আমাদের সনামধন্য পীর ও সাজাদানশীঁরা উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে, সেখানে এই জামাত ইসলামের অসাধারণ সেবাদানে নিজেদের সংকল্পবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছে। "

(জমীনদার, লাহোর, ২৪ শে জুন, ১৯২৩)

এরপর ১৯২৩ সালের ২৯ শে জুনের প্রকাশনায় এই স্বীকারুক্তি দিয়েছে-

"কাদিয়ানী আহমদীরা আত্মত্যাগের উচ্চ মান প্রদর্শন করছে। তাদের প্রায় একশজন মুবাল্লিগ আমীর ও দলের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে মোর্চা খুলেছে। তারা চোখে পড়ার মত কাজ করেছে। সমস্ত মুবাল্লিগ বিনা বেতনে এবং বিনা সফর খরচে কাজ করছে। আমরা আহমদী না হলেও আহমদীদের উৎকৃষ্ট কাজের প্রশংসা না করে পারি না। আত্মত্যাগের যে উচ্চ মানের স্বাক্ষর জামাত আহমদীয়া রেখেছে তার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তীদের ব্যতিরেকে অন্যদের মাঝে পাওয়া দুষ্কর। দরিদ্র হোক বা ধনী, তাদের প্রত্যেক মুবাল্লিগ বিনা সফর খরচ ও খোরাক না গ্রহণ করেই কর্মক্ষেত্রে কাজ করছে। প্রচণ্ড গরম এবং দাবদাহে তারা নিজেদের নেতাদের আনুগত্যে কাজ করছে।"

(জমীনদার, লাহোর, ২৯ শে জুন, ১৯২৩)

মাশরিক পত্রিকা (গোরক্ষপুর) লেখে-

"জামাত আহমদীয়া বিশেষ করে আর্য মতবাদে উপর মোক্ষম আঘাত হেনেছে। আর জামাত আহমদীয়া যে আত্মাত্যাগের প্রেরণা এবং বেদনার সাথে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করে তা এযুগের অন্যান্য জামাতের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

(মাশরিক পত্রিকা, গোরক্ষপুর, ১৫ই মার্চ, ১৯২৩)

কয়েকদিন পর এই একই পত্রিকায় এই সত্য স্বীকার করে নেয় যে-

"জামাত আহমদীয়ার ইমাম ও নেতার ভাষণ ও লেখনীর নিরবিচ্ছিন্ন ধারা তাঁর অনুসারীদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে আর এই জিহাদে বর্তমানে এই ফির্কাটিকেই সকলের চায়তে এগিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। আর যদিও আহমদী ফির্কার মতে এই নতুন মুসলিম দলটির সমর্থনের প্রয়োজন ছিল না, কেননা এই ফির্কার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু যেহেতু ইসলামের নাম যুক্ত ছিল, তাই সেই লজ্জায় জামাতে আহমদীয়ার ইমামের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কিছু বক্তব্য শুনে মনের মনের মধ্যে হ্যায়বত হয়,এই ভেবে যে, এখনও খোদার নামে জীবনোৎসর্গকারীরা রয়েছে আর যদি আমাদের উলেমাদের মনে এবিষয়ের শঙ্কা হয় যে, জামাত আহমদীয়া নিজেদের ধর্মবিশ্বাস দিবে, তবে তারা নিজেরা ঐক্যমত জামাত হিসেবে এমন নিষ্ঠা তৈরী করে এগিয়ে যাক- ছাতু, ছোলা খেয়ে বেঁচে থাকুক আর ইসলামকে রক্ষা করুক। জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের মধ্যে আমরা এই নিষ্ঠা প্রায়ই দেখতে পাই। বিশ্বস্ততা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং ইমামের

আনুগত্যের বিষয়ে এই জামাত অনন্য। জনাব মির্যা সাহেব এবং তাঁর জামাতের অদম্য উৎসাহ ও আত্মত্যাগের স্পৃহার প্রশংসার পাশাপাশি আমরা মুসলমানদের মধ্যে এমন আত্মত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য জাতিগত অস্মিতাকে জাগানোর চেষ্টা করছি। বিশ্বস্ততা, আমানতরক্ষা যা মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল আজ তা তাদের মধ্যে প্রকট ভাবে লক্ষ্যনীয়। জামাত আহমদীয়ার উদারতা ও আত্মত্যাগের চেতনার পাশাপাশি তাদের বিশ্বস্ততা এবং আয়-ব্যায়ের হিসেবে স্বচ্ছতা এবং নিয়মানুবর্তিতা সব থেকে বেশি ঈর্ষনীয় বিষয়। আর এই কারণেই স্বল্প আয় হওয়া সত্ত্বে এরা বড় বড় কাজ করছে।"

(মাশরিক পত্রিকা, গোরক্ষপুর, ২৯ শে মার্চ, ১৯২৩)

অনুরূপভাবে অমৃতসরের উকিল পত্রিকা লেখে-

"আহমদী জামাতের কর্মপন্থা এদিক থেকে অত্যন্ত প্রশংনীয় যাদেরকে কটাক্ষ করা সত্ত্বেও কেবল ইসলামকে কুনজর থেকে রক্ষা করার ভাবনা নিয়ে সেই সব গৃহযুদ্ধকে প্রতিহত করার প্রতি মুসলমানদের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আর এবং যে কোনও ভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ... আমরা সজ্ঞানে একথার ঘোষণা দিচ্ছি যে, কাদিয়ানের আহমদী জামাত চমৎকার কাজ করছে।"

"উকিল পত্রিকা, অমৃতসর, ৩রা মে, ১৯২৩)

লাহোর থেকে প্রকাশিত তাহজীবুন নিসওয়াঁ পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মমতাজ আলি সাহেব লেখেন-

'আমি শুনেছি, ইসলাম ধর্ম থেকে পলায়ন রোখার ময়দানে ইসলামের প্রত্যেক ফির্কা তবলীগের জন্য নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। তাই আমি যে ফির্কার মুবাল্লিগদেরকে বেশি সফল হতে দেখেছি তাদের মধ্য থেকে একজনকে নিজের জন্য নির্বাচিত করা সমীচীন বলে মনে করি। সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, তবলীগের কাজে সব থেকে বেশি সফল হয়েছে আহমদী মুবাল্লিগগণ। তাই আমার ইচ্ছে, পত্রিকার পাঠিকাদের আপত্তি না থাকলে তারা যে কোনও একজন মুবাল্লিগের ব্যায়ভারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু এরই মাঝে আমাদের উলেমাগণ এই ঘোষণা প্রকাশিত করেন যে, আহমদী ফির্কার লোকেরা সব কাফের। তাদের কুফর মালকানার রাজপুতদের কুফরদের চেয়ে বেশি কঠিন। "

(তাহজীবুন নিসওয়াঁ পত্রিকা, লাহোর, ২রা মে, ১৯২৫)

এগুলি ছিল মুসলমান পত্রিকার সাক্ষ্য। হিন্দু পত্রিকাগুলির কয়েকটি স্বীকারুক্তিও পাঠযোগ্য। ইসলামের প্রতিরক্ষায় কারা সব থেকে বেশি তাদের উপর প্রহার করেছে, সেকথা তারাই জানত। আর কার প্রহারে তাদের বুক ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সেকথাও তারাই ভাল বলতে পারত। দেখা যাক তারা কি বলেছে-

"দেব সমাজী পত্রিকার জীবন নীত, লাহোর লেখে-

"মালকানা রাজপুতদের শুদ্ধি আন্দোলন প্রতিহত করতে এবং মালকানাদের মাঝে ইসলামী মতবাদ প্রচারের জন্য আহমদী সদস্যরা বিশেষ উদ্দীপনার বহিঃপ্রকাশ করছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে কাদিয়ানী ফির্কার শীর্ষ নেতা মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব দেড়শ সেবকের জন্য আবেদন করেছিলেন যারা তিন মাসের জন্য মালকানায় গিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে প্রস্তুত হবে, যারা নিজেদের এবং নিজেদের এবং পরিবারের, সেখানকার পথ খরচ ইত্যাদি সমস্ত খরচ করতে পারবে আর ব্যবস্থাপনার অধীনে যে কাজের দায়িত্ব তাদের দেওয়া হবে সেই কাজ তারা সানন্দে করতে প্রস্তুত থাকবে। বর্ণিত আছে যে, এই আহ্বানের চার সপ্তাহের মধ্যে শর্তের দাবি মেনে চারশর অধিক আবেদনপত্র জমা পড়েছে আর তিনটি দলে মোট ৯০জন আহমদী আগ্রার এলাকায় পোঁছে গিয়েছে আর ভীষণ সক্রিয়তার সাথে মালকানাদের মাঝে নিজেদের প্রচার করছে। এই নতুন এলাকার পরিস্থিতি জানার জন্য তাদের মধ্য থেকে কিছু যুবক, যারা স্নাতক ছিল, নিজেদের কাঁথা-কম্বল কাঁধে নিয়ে প্রখর রোদে পায়ে হেঁটে সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছে। নিজেদের ধর্মমত প্রচারে জন্য তাদের উৎসাহ ও আত্মত্যাগের স্পৃহা প্রশংসনীয়।"

(জীবন নীত পত্রিকা, লাহোর, ২৪ এপ্রিল, ২০২৩)

বরেলী থেকে প্রকাশিত 'আর্য পত্রিকা' ১লা এপ্রিল ১৯২৩ এর সংখ্যায় লেখে-

'বর্তমানে মালকানা রাজপুতদেরকে তাদের পূর্বের রাজপুত জাতিতে প্রত্যাবর্তন থেকে বিরত রাখতে (অর্থাৎ ধর্মচ্যুত হওয়া থেকে বিরত রাখতে: অনুবাদক) যতগুলি ইসলামী আঞ্জুমান এবং জামাত কাজ করছে, তাদের মধ্যে কাদিয়ানের আহমদীয়া জামাতের সক্রিয়তা এবং প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। "

"হিন্দু ধর্ম এবং শুদ্ধি আন্দোলন'-এর প্রণেতা একথা স্বীকার করেন যে,

" আর্য সমাজ শুদ্ধি অর্থাৎ পবিত্রকরণে পন্থার সূচনা করেছে। এমনটি করলে আর্য সমাজের সঙ্গে মুসলমানদের একটি তবলীগি দল, অর্থাৎ কাদিয়ানী ফির্কার সঙ্গে সংঘাত বাধে। আর্য সমাজের দাবি, বেদ হল দিব্যবাণী এবং আদি ঐশী গ্রন্থ এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান। কাদিয়ানীদের দাবি, কুরআন শরীফ খোদার বাণী আর হযরত মহম্মদ খাতামান্নাবীঈন। এই বাক-বিতণ্ডার পরিণামে কোনও খৃষ্টান বা মুসলমান এখন আর ধর্মের জন্য আর্য সমাজে যোগ দেয় না।"

(হিন্দুধর্ম ও শুদ্ধি আন্দোলন, পৃ: ২৩-২৪)

শুদ্ধির লড়াইয়ের প্রভাব এতটাই গভীর ছিল ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে, মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ-এর মহান নেতৃত্বের দাপট আর্য সমাজের নেতাদের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করে। শুদ্ধি আন্দোলেন এসে চলেও গেল কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত আর্য নেতাদের মনে সেই তিক্ত ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি অক্ষত থেকে যায় যা শুদ্ধির লড়াইয়ে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সংঘাতের পরিণামে তাদেরকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল। চার বছর পর তেজ দিল্লী থেকে প্রকাশিত তেজ পত্রিকা একথা স্বীকার করে যে,

'আমার মতে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে সব থেকে বেশি গঠনমূলক, কার্যকরী ও নিরবিচ্ছিন্ন কার্য সম্পাদনকারী জামাত হল 'জামাত আহমদীয়া। আমি সত্যি সত্যি বলছি, আমরা সব থেকে বেশি এই জামাত সম্পর্কে উদাসীন আর আজ পর্যন্ত আমরা এই ভয়ানক জামাতটিকে বোঝার চেষ্টাই করি নি।

(তেজ পত্রিকা, দিল্লী, ২৫ শে জুলাই, ১৯২৭)

পত্রিকাটি আরও লেখে-

" আজ থেকে ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্বে এই জামাতটি যখন এর প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, সেই সময় গিয়ে দেখুন, তখন হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে এই জামাতটি এতটাই তুচ্ছ ও অবহেলার পাত্র বলে মনে করত। হিন্দুরা তো পরের কথা, মুসলমানেরা নিজেরাই সব সময় এদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছে, তাদেরকে অভিসম্পাত করেছে। এই জামাত প্রারম্ভিক যুগে বহু কষ্টে যে সব কাজের সূচনা করেছিল, সেগুলির অধিকাংশ সুসম্পন্ন হয়েছে। সেই যখন আহমদীরা যখন সেই সব কাজের সূচনা করেছিল, তখন তাদেরকে উন্মাদ বলে মনে করা হত আর তাদের নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসি ঠাট্টা করা হত। কিন্তু বাস্তবে তাদের নিয়ে উপহাসকারীরা নিজেরাই নির্বোধ ও আহাম্মক ছিল। এক্ষেত্রে খৃষ্টান প্রচারকরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। আহমদীরা ইউরোপ ও আমেরিকার বুকে পা রাখতে না রাখতেই সমস্ত পাদ্রীরা তাদের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। "

(তেজ পত্রিকা, দিল্লী, ২৫ শে জুলাই, ১৯২৭)

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, এমন একটি জামাত যারা অসহায় অবস্থায় খৃষ্টান জগতে অত্যন্ত দুঃসাহিসকতা ও বীরত্বের সাথে মোমেনসুলভ মর্যাদায় আক্রমণোদ্যত হয়েছে আর পাদ্রীরা এর মোকাবেলা সারিবদ্ধ হচ্ছে, এমন জামাতের উপর অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে যে, এরা খৃষ্টান সরকারের রোপিত চারা। সত্যকে আড়াল করারও একটা সীমা থাকা দরকার না কি কতকের নিকট এর হয়তো কোনও সীমাই নেই!

মাহাশা কৃষ্ণ শুদ্ধি আন্দোলনের ছয় বছর পর জামাত আহমদীয়ার তবলীগি প্রচেষ্টাকে হিন্দুধর্মের জন্য ভয়াবহ বিপদ অনুধাবন করে বলেন-

"সমস্যা হল হিন্দুদের জন্য তাদেরই এক স্বদেশবাসী জামাতের পক্ষ থেকে বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। আর সেই বিপদটি এতটাই সুবিশাল যে, এর পরিণামে আর্য জাতির অস্তিত্ব মুছে যেতে পারে। বিপদটি হল সংগঠন ও প্রচারের, মুসলমানরে পক্ষ থেকে এই কাজ এমন ক্ষিপ্র গতিতে হচ্ছে যে, হিন্দুদের পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ফি বছর হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এদেরকে যদি কোনওভাবে প্রতিহত না করা যায় তবে এমন এক সময় আসতে পারে যখন আর্যধর্মের নাম উচ্চারণকারী কেউ থাকবে না।"

(প্রতাপ পত্রিকা, লাহোর, ২১ শে অক্টোবর, ১৯২৯)

ভেবে দেখুন! মাত্র কয়েক বছর পূর্বেই আর্য সমাজের দাবি কি ছিল আর কি আস্ফালন ছিল। মুসলমানদেরকে সাজসরঞ্জামহীন ও অসহায় মনে করে তারা নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল আর নিজেদের ক্ষমতার নেশায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে ঘোষণা করছিল-

" হে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা! শুদ্ধির কাজ যেন কখনও থেকে না থাকে।

এরপর ২২ পাতায়.....

মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি, গুরুত্ব এবং এর সত্যায়ন স্থল

– সৈয়্যদ বাশারত আহমদ, সদর মহল্লা দারুল আমান,কাদিয়ান।

খোদা তা'লা এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ইসলাম এবং হযরত মহম্মদ (স.)–এর সত্যতার যে নিদর্শন দান করেছেন তার মধ্য থেকে সব থেকে বড় নিদর্শন হল মুসলেহ মওউদ–এর ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমিকা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং এর সত্যায়নস্থল সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর এবং এর বিবরণ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর রচনাসমূহে বিদ্যমান।

ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমিকা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ (আ.)–এর মহান রচনা 'বরাহীনে আহমদীয়া' আত্মপ্রকাশ করার ফলে ইসলাম জগতে আনন্দের ঢেউ বইয়ে যায়। অপরদিকে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে হুলস্থুল বেঁধে যায়। হযরত আকদস (আ.) এই পুস্তকেই জগতবাসীকে একটি সুসংবাদ সম্পর্কে অবগত করে বলেন–

'খোদাওয়ান্দ তা'লা এই অধম বান্দাকে এই যুগে সৃষ্টি করে শত শত স্বর্গীয় ও অলৌকিক নিদর্শন এবং নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন এবং শত শত অকাট্য যুক্তি ও জ্ঞান দান করে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন যাতে তিনি কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা প্রতিটি দেশ ও জাতির মাঝে বিস্তৃত ও প্রচলন করে তাদের উপর 'হুজ্জত' (চূড়ান্ত যুক্তি প্রতিষ্ঠা) পূর্ণ করেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রুহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৬)

এই সুসংবাদের ঘোষণা তিনি ভারতের পাশাপাশি পত্রের মাধ্যমে বিদেশেও পৌঁছে দিলেন এবং সাধ্যানুসারে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের উপর 'হুজ্জত' (অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন) পূর্ণ করলেন। চতুর্দিকে ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জয়ধ্বনি মুখরিত হতে শুরু করল আর প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে ইসলামের জীবন্ত নিদর্শন দেখার জন্য আহ্বান জানানো হল।ঠিক সেই সময়, অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে কাদিয়ানের আর্য এবং হিন্দু ধর্মের প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর নামে একটি পত্র এসে পৌঁছল। এই চিঠিতে দাবি করা হয়–

'যেভাবে আপনি লন্ডন এবং আমেরিকায় রেজিস্ট্রিকৃত পত্রের মাধ্যমে এই মর্মে নিবন্ধ প্রেরণ করেছেন যে, যে– সত্যান্বেষী আপনার কাছে এক বছর কাদিয়ানে এসে থাকবে, খোদা তা'লা তার জন্য ইসলামের সত্যতা প্রমাণের এমন নিদর্শন প্রদর্শন করবেন যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে হবে। আমরা যেহেতু আপনার প্রতিবেশী এবং সহনাগরিক, তাই লন্ডন এবং আমেরিকাবাসীদের থেকে আমাদের অধিকার বেশি বর্তায়। .... কিন্তু আমরা কেবল এতটুকু নিদর্শনেই সন্তুষ্ট হব যাতে আকাশ ও পৃথিবী ওলট পালট করার প্রয়োজন নেই, প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করারও কোনও প্রয়োজন নেই। তবে এমন নিদর্শন অবশ্যই চাই যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে, যাতে জানা যায় যে সেই পবিত্র পরমেশ্বর আপনার ধর্মীয় সত্যতা অনুসারেই ভালবাসা ও কৃপাসুলভ আচরণের মাধ্যমে আপনার দোয়া কবুল করেন এবং দোয়া কবুল করার পূর্বে তিনি আপনাকে জানিয়ে দেন বা তিনি আপনাকে তাঁর কিছু কিছু বিশেষ রহস্য সম্পর্কে অবগত করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই সব গোপন রহস্যের সংবাদ সম্পর্কে আপনাকে অবগত করেন কিম্বা এমন অভাবনীয়ভাবে আপনাকে সাহায্য ও সমর্থন করেন যেমনটি তিনি আদিকাল থেকে স্বীয় প্রিয় ও নৈকট্যভাজন ও ভক্তজনদের করে এসেছেন।.... আর যে বছরটি নিদর্শন প্রকাশের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে সেটি ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ধার্য হবে এবং এর মেয়াদ হল ১৮৮৬ সালের শেষ পর্যন্ত। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড,পৃ: ৯২)

এই পত্রের শেষে দশজন হিন্দু নেতার নাম লিপিবদ্ধ ছিল। পত্রটি পেয়ে হযরত আকদস (আ.) উত্তরে লিখলেন–

'আপনারা স্বর্গীয় নিদর্শন দেখার আবেদন জানিয়ে যে চিঠিটি লিখেছিলেন সেটি আমি প্রাপ্ত হয়েছি। যেহেতু চিঠিটি সম্পূর্ণরূপে সত্য ও ন্যায় অন্বেষণমূলক আর দশ সদস্যের সত্যান্বেষী দলের পক্ষ থেকে লেখা,তাই পুরো কৃতজ্ঞতার সাথে আপনাদের এই পত্র গ্রহণ করছি আর আপনাদের নিকট অঙ্গীকার করছি, আপনারা যদি চিঠিতে লিপিবদ্ধ প্রতিশ্রুতিগুলি রক্ষা করে চলেন, তবে নিশ্চয় সর্বশক্তিমান খোদার সাহায্য ও সমর্থনে এক বছরের মধ্যে আপনাদের জন্য এমন কোনও নিদর্শন প্রকাশিত হবে যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে হবে। আপনাদের ন্যায়ানুনাগ পত্র পেয়ে ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর ইশতেহার থেকে যেমনটি প্রকাশ পাচ্ছে, তিনি সেই সব হিন্দুদের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন, এই ভেবে যে, ইসলামের সত্যতার নিদর্শন চাওয়া হচ্ছে। হুযুর (আ.) এই নিদর্শন প্রকাশের জন্য সেই একমেবদ্বিতীয় খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, যাঁর সাহায্য ও সমর্থনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি থেকে সংবাদ পেয়ে সেই যুগে তিনি ইসলামের সত্যতার ঘোষণা করেছিলেন। এবং পরম অনুনয়–বিনয় সহকারে তিনি খোদার কাছে এই নিদর্শনের জন্য দোয়া করেছিলেন।দোয়ায় একাগ্রতা ও আত্মবিলীনতা তৈরী এবং নিজেকে যাবতীয় প্রকারের বাধা–বিঘ্ন থেকে রক্ষা পেতে তিনি এক নির্জন ও নিভৃত স্থান বেছে নিকে মনস্থির করেন। আর এই উদ্দেশ্যে তিনি ঘরবাড়ি ও আত্মীয়স্বজনদের থেকে দূরে হোশিয়ারপুরে এতেকাফ করেন এবং জগত থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করেন। পরম দয়ালু খোদা তাঁর অনুনয় বিনয় ও ব্যগ্রতা এবং ইসলামের সত্যতার জন্য আকুলতা দেখে তাঁকে আশ্বস্ত করেন এবং তাঁর দোয়াসমূহ কবুল করে মুসলেহ মওউদ –এর মহান সুসংবাদ দান করেন।

মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিন্দু এবং মুসলমানদের কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে আপত্তি করা হয়। কিন্তু হুযুর (আ.) ইশতেহার ও পত্রের মাধ্যমে সেই সব আপত্তির উত্তর দেন। হযরত আকদস –এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। হযরত আকদস বিরুদ্ধে এটাই আপত্তি করা হয়েছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে পুত্র সন্তানের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। কিন্তু এর থেকে বেশি এ বিষয় নিয়ে উচ্চবাচ্য তৈরী হয় যে, বাড়িতে পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়া কি এমন নিদর্শন? বিয়ের পর সন্তান হওয়াই তো স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর উপর দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা নয় বছরের মধ্যে এক মহান পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুত সন্তান ছাড়া অন্য কোনও সন্তানের জন্ম হবে না, এমন কথাও ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয় নি। এছাড়াও বিয়ের পর সন্তান হওয়া স্বাভাবিক বিষয় হলেও কেউই নিজের সম্পর্কে পূর্বাহ্নে এমন অকাট্য দাবি করতে পারবে না। এখানে শুধু পুত্র সন্তানের জন্মের ঐশী প্রতিশ্রুতির ঘোষণাই ছিল না, বরং এক দৃঢ়চেতা, মর্যাদাবান ও অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী এক পুত্রের ঘোষণা ছিল, যার মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর জীবনাবসানের পর ইসলামের মহান সেবা এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর প্রসার লাভের উল্লেখ ছিল।

প্রথম বশীর–এর জন্ম এবং হযরত মসীহ মওউদ(আ.)–এর দেওয়া স্পষ্টীকরণ

প্রথম কন্যার জন্মের পর ১৮৮৭ সালের ৭ই আগস্ট তারিখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) –এর পুত্র সন্তানের জন্ম হয় যার নাম রাখা হয় বশীর। সাহেবযাদা বশীর (প্রথম)–এর জন্মের পূর্বেই ১৮৮৬ সালের ৮ই এপ্রিল গর্ভাবস্থাতেই হুযুর (আ.) তাঁর এক ইশতেহারে এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন–

"একথা প্রকাশ করা হয় নি যে এখন যে জন্ম নিবে সেই হবে সেই প্রতিশ্রুত সন্তান, না কি নয় বছরের মধ্যে অন্য কোনও সময় সেই সন্তান জন্ম নিবে। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৭)

এরপর সাহেবযাদা বশীর (প্রথম)–এর জন্ম হওয়ার পর মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী প্রশ্ন করেছিলেন যে, এই নবজাতকটিই সেই প্রতিশ্রুত পুত্র যার কথা ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে? এর উত্তরে হুযুর (আ.) বলেন:

"নবজাতক পুত্র সম্পর্কে আমি কোনও পত্রিকায় এই মর্মে কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ করি নি যে, এটিই সেই ছেলে যার সম্পর্কে ২০ ফেব্রুয়ারীর ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৬)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কিয়ামত দিবসে আমিই হব সর্বপ্রথম 'শাফায়াত' দানকারী আর সর্বপ্রথম আমার 'শাফায়াত' গৃহীত হবে।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

হযরত আকদস (আ.)-এর দৃষ্টিতে ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

সেই যুগেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত 'সীরাজে মুনীর' নামে একটি পুস্তিকা রচনায় ব্রতী হন। উদ্দেশ্য ছিল এই পুস্তিকায় ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত পুত্রের কথা ঘোষণা করা। মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী হুযুর (আ.)-কে লেখা একটি চিঠিতে সেই প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণীটিকে সীরাজে মুনীর পুস্তকে উল্লেখ করার প্রস্তব দেন। হুযুর (আ.) উত্তরে লেখেন-

"তরুণ সেবক তার পত্রে উল্লেখ করেছিল যে পুত্র সন্তান সংবলিত ভবিষ্যদ্বাণীটিকে পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা সমীচীন হবে না। আমি এযাবৎ আপনাকে এর উত্তর লিখি নি, কারণ খোদা তা'লা এই বিষয়টিতে আপনার মতামতের সঙ্গে আমার মতকে এক করেন নি। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন।' আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমকে এ বিষয়ে ঘোষণা ও প্রকাশ করার আদেশ করা হয়েছে। আর যেমনটি আমার প্রভু-প্রতিপালক ও অনুগ্রহশীল মহাকল্যাণকারী খোদা আমাকে আদেশ করেছেন, আমি সেই কাজ করতে বাধ্য। জাগতিক বিবেচনার কি চাহিদা ও কৌশল ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই জাগতিক সম্মান ও অসম্মানের সঙ্গেও আমার কোন সংশ্রব নেই। এর প্রতি আমার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই, কোনও আশাঙ্কাও নেই। আমি জানি, যে বিষয়গুলি প্রকাশ করার জন্য আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি, সংশয়াসক্ত যুগ সেগুলিকে যতই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখুক না কেন, অনাগত ভবিষ্যত এর থেকে প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৪-৩০৫)

হযরত আকদস (আ.) তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীটি বাদ দিতে রাজি হলেন না, উপরন্ত তাঁর অবিচলতা এবং প্রত্যয় দেখে এবং অনুভব করে মৌলবী সাহেব আরও একটি চিঠি লিখে পাঠান। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'এমন ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা ইসলামের কোনও হিতসাধন হবে না, বরং এতে মুসলমানদের অবমাননা হবে।' মৌলবী সাহেব এই অবমাননা থেকে রক্ষা পেতে এবার পরামর্শ দিলেন, 'আপাতত সীরাজে মুনীর প্রকাশ করার পরিকল্পনা থেকে সরে আসুন'। হযরত আকদস (আ.) উত্তরে লিখলেন-

"আপনি বলেছেন, সীরাজে মুনীর পুস্তকে সেই ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাই আমার মতে সীরাজে মুনীর ছাপানো মুলতুবি রাখা হোক। কেননা, এমন পুস্তকের কারণে মুসলমানদের ভয়ানক লাঞ্ছনা হবে। এর উত্তরে আমি বলতে চাই, নিঃসন্দেহে সীরাজে মুনীরে এমন ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, বরং সর্বোপরি এমন ভবিষ্যদ্বাণীই রয়েছে, কিন্তু - "এতে মুসলমানদের ভয়ানক অসম্মান হবে"- আপনার এই দ্বিতীয় বাক্যটি যথাযথ অন্তদৃর্ষ্টি ভিত্তিক নয়। আর 'আমার চিন্তা কেবল এতটুকু যে মুসলমানদের বেশি অসম্মান যেন না হয় আর তাদের সম্পদের অকারণ অপচয় না হয়।' আপনার এই বাক্যটি থেকে প্রমাণ হয় যে, পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়ায় মুসলমানদের বড় সড় অসম্মান হয়েছে আর পরবর্তীতে সীরাজে মুনীর প্রকাশিত হলে আরও বেশি অসম্মান হবে। এখন আমি বলছি, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্যতার সাথে প্রকাশ পাওয়া মুসলমানদের জন্য অসম্মানের কারণ হয় তবে এই অসম্মান যতটা হবে ততটাই কম।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড,পৃ: ৩০৮-৩০৯)

এরপর হুযুর (আ.) ১৮৮৬ সালের ২২ শে মার্চ তারিখের ইশতেহারে কতিপয় আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে লেখেন-

'একজন নির্বোধও বুঝতে পারে যে, গভীর দৃষ্টিতে ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে, এটি মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে, ঐশী নিদর্শন হওয়া নিয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। সন্দেহ থাকলে এমন নিদর্শন সংবলিত এই একই ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী কেউ উপস্থাপন করুক। এখানে চোখে খুলে দেখা উচিত যে, এটি নিছক একটি ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং এক মহান স্বর্গীয় নিদর্শন যা পরম দয়াময় ও প্রতাপশালী খোদা আমাদের নবী করীম হযরত মহম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য প্রকাশ করেছেন। আর বস্তুত এই নিদর্শনটি মৃতকে জীবিত করার থেকেও শতগুণে উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ। ....

এখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুকম্পা হযরত খাতামুল আম্বিয়া-এর কল্যাণে এই অধমের দোয়া কবুল করে এমন আশিসময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বরকতসমূহ সমগ্র জগতের বিস্তৃত হবে। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৪,১১৫)

প্রথম বশীরের মৃত্যু এবং হযরত আকদস (আ.) বক্তব্য।

১৮৮৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর সাহেবযাদা বশীর (প্রথম)-আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছানুসারে মৃত্যু বরণ করে আর বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধীতা ঝড় বইতে শুরু করে। সেই সময় হযরত আকদস (আ.) সমস্ত সমালোচকদের জবাব দিতে একটি পুস্তিকা রচনা করেন যার নাম 'হাক্কানী তকরীর বার ওয়াকেয়া ওফাতে বশীর'। পুস্তকটি সবুজ রঙের কাগজে ছাপানো হয় যার কারণে পরবর্তীতে এটি 'সবুজ ইশতেহার' নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি (আ.) এই ইশতেহারে লেখেন-

এই অধমের পক্ষ থেকে যতগুলো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে.... সেগুলো থেকে প্রয়াত ছেলেই মুসলেহ্ মাওউদ এবং দীর্ঘজীবন লাভকারী মর্মে এতে দাবী করা হয়েছে বলে কোনো ব্যক্তি একটি শব্দও দেখাতে পারবে না।

(সবুজ ইশতেহার, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৮)

তিনি আরও বলেন-

"এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যদি আমরা ইলহামে মৃত ছেলের ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা ও প্রকৃতিগত দীপ্তি সম্বলিত যেসব গুণাগুণ বিকশিত হয়েছে, অর্থাৎ, মুবাশ্বের, বশীর, নূর উল্লাহ্, সাইয়েব এবং চেরাগ দ্বীন ইত্যাদি নামের কারণে কোনো বিশদ ও বিস্তারিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতাম আর তাতে সেসব নামের বরাত দিয়ে নিজস্ব এই মতামত প্রকাশ করতাম যে, সে-ই সম্ভবত মুসলেহ মওউদও দীর্ঘ জীবন লাভকারী ছেলে হবে; তবুও দৃষ্টিবানদের মতে আমাদের এই অনুমাননির্ভর বিবৃতি আপত্তিকর হতো না। কেননা, তাদের ন্যায়নীতিসূলভ চিন্তা-চেতনা এবং অন্তর্দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে বুঝিয়ে দিতো যে, কেবল কয়েকটি নামের প্রতি লক্ষ্য করেই এই অনুমিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যা সুস্পষ্ট নয়; বরং এর একাধিক অর্থ করা যেতে পারে, আর তা সবই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তাই, তাদের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তি হলেও এটি একটি অত্যন্ত ছোট ও গুরুত্বহীন দুর্বলতা বলে গণ্য হতো। যদিও মাথা-মোটা ও অন্ধ-হৃদয় মানুষকে সেই ঐশী নিয়ম-নীতি বা বিধান বুঝানো খুবই কঠিন, যা আদি থেকেই দ্ব্যর্থবোধক ওহী, স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং ইলহাম সম্পর্কে চলে আসছে। কিন্তু, যারা তত্ত্বজ্ঞানী ও দৃষ্টিবান তারা খুব ভালোভাবেই জানে, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি সম্পর্কে যদি ধারণা বা অনুমান নির্ভর কোনো ভুলভ্রান্তি হয়েও যায় তবুও তা কোনোভাবেই সমালোচনার কারণ হতে পারে না।"

(সবুজ ইশতেহার, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫০-৪৫১)

তিনি আরও বলেন-

"রহমত অবতীর্ণ করা এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণে ভূষিত করার জন্য খোদা তা'লার দু'টি সুমহান রীতি রয়েছে। যথা: (১) প্রথমত কোনো সমস্যা ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে ধৈর্যশীলদের জন্য ক্ষমা ও দয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে, যেমনটি তিনি স্বয়ং বলেছেন:

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ. الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৫৬-১৫৮) অর্থাৎ, এটিই আমাদের বিধান, আমরা মু'মিনদের বিভিন্ন ধরনের বিপদে নিপতিত করি আর ধৈর্যশীলদের প্রতি আমাদের দয়া বর্ষিত হয়। আর সফলতার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় যারা ধৈর্যশীল।

(২) রহমত অবতীর্ণ করার দ্বিতীয় রীতি হলো, নবী-রসূল, ইমাম, ওলী ও খলীফা প্রেরণ- যাতে তাঁদের অনুসরণ ও পথ-নির্দেশনায় মানুষ সঠিক পথ-প্রাপ্ত হয় আর তাঁদের আদর্শের আদলে নিজেকে গড়ে তুলে মুক্তি লাভ করে। খোদা তা'লা এ অধমের আওলাদের মাধ্যমে এ উভয়দিকের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চেয়েছেন। অতএব, তিনি প্রথম প্রকার রহমত বর্ষণের জন্য প্রথমে বশীরকে প্রেরণ করেছেন যেন মু'মিনদের জন্য بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ - এর উপকরণ প্রস্তুত করে নিজ সুসংবাদ প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়।

এছাড়া, যে দ্বিতীয় প্রকার রহমতের বিবরণ আমরা এখন দিয়েছি, তা পূরণার্থে খোদা তা'লা দ্বিতীয় বশীরকে প্রেরণ করবেন, যেমনটি প্রথম বশীরের মৃত্যুর পূর্বে ১৮৮৮ সনের ১৯ জুলাইয়ের বিজ্ঞাপনে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর খোদা তা'লা এই অধমের নিকট প্রকাশ করেছেন যে, 'তোমাকে দ্বিতীয় এক বশীর দেওয়া হবে, যার নাম মাহমুদও হবে, আর সে নিজ কর্মে দৃঢ়প্রত্যয়ী হবে।' [অর্থাৎ, আল্লাহ্ যা চান সৃষ্টি করেন। সূরা আন্ নূর: ৪৬-অনুবাদক]

(সবুজ ইশতেহার, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬১, টিকা)

এই সবুজ ইশতেহারটি মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই

ইশতেহারেই আল্লাহ্ তা'লা দুই প্রকারের রহমতের উল্লেখ করার পর হুযুর (আ.) বলেছেন, এই অধমের সন্তানের মাধ্যমে এই দুটি অংশ প্রকাশিত হওয়াই খোদা তা'লার অভিপ্রায়। যা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, মুসলেহ মওউদ -এর সত্তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ঔরসজাত সন্তান হওয়া নির্ধারিত ছিল, ভবিষ্যতে কোনও যুগে আধ্যাত্মিক সন্তান হিসেবে নয়। আর আগমণকারী বশীর সম্পর্কে হুযুর (আ.) একথাও বলেন যে, সে নবী, মুরসিল, আওলিয়া এবং খলীফাদের মর্যাদায় ভূষিত হবে। হযরত আকদস যেহেতু নিজেই নবী ও মুরসিলদের মর্যাদা আসীন ছিলেন, তাই এই প্রতিশ্রুত সন্তানের জন্য ইমাম, ওলী এবং খলীফার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল আর তার অনুসরণ করাকে হুযুর নাজাত প্রাপ্তি এবং সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর লেখনীতে বিভিন্ন স্থানে তাঁর সুসংবাদদাতা সন্তানের উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রত্যেক পুত্র কিম্বা কন্যা সম্পর্কে তার জন্মের পূর্বেই জন্মের বিষয়ে পুস্তক কিম্বা ইশতেহারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু সবুজ ইশতেহারে যে পুত্র সন্তানের জন্ম সংবাদের উল্লেখ রয়েছে , সর্বদা তিনি মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবকেই তার সত্যায়নস্থল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর প্রমাণ হিসেবে নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি প্রনিধাণযোগ্য।

হুযুর (আ.) তাঁর রচনা 'সীরাজে মুনীর'-এ তাঁর সত্য ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করে বলেন: 'আমার ছেলে মাহমুদের জন্মের বিষয়ে পঞ্চম যে ভবিষ্যদ্বাণীটি আমি করেছিলাম, অর্থাৎ এই সময়ে সে জন্ম গ্রহণ করবে আর তার নাম মাহমুদ রাখা হবে আর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের জন্য সবুজ রঙের পাতায় ইশতেহার ছাপা হয়েছিল যা এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে আর হাজার হাজার মানুষের কাছে বিতরণ করা হয়েছিল। সুতরাং, সেই ছেলে ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ধারিত সময়েই জন্ম গ্রহণ করেছে আর তার বয়স নয় বছর। "

(সীরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৬)

সীরাজে মুনীর পুস্তকের এই লেখনীর টিকাতে হুযুর আরও বলেন- 'সবুজ ইশতেহারে স্পষ্ট বাক্যে অবিলম্বে পুত্র সন্তান জন্মের প্রতিশ্রুতি ছিল। যার পরেই মাহমুদের জন্ম। এই ভবিষ্যদ্বাণী কতই না মহান, যদি খোদা-ভীতি থাকে তবে পবিত্র অন্তকরণে ভেবে দেখ।

হুযুর আকদস তাঁর রচনা 'আঞ্জামে আথম' পুস্তকে লেখেন-

"এছাড়াও আরও একটি নিদর্শন হল, এই যে তিনটি ছেলে এখানে উপস্থিত আছে, প্রত্যেকের জন্মের পূর্বেই তাদের আগমণের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন, বড় ছেলে মাহমুদের জন্মের বিষয়ে সবুজ ইশতেহারে মাহমুদের নাম সহ স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান । যেটি প্রথম পুত্রের মৃত্যুর সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছিল যা সবুজ রঙের পুস্তিকাকারে বেশ কয়েক পাতার পুস্তিকা ছিল। আর মাঝে জন বশীর নামে যে পুত্রটি রয়েছে তার সংবাদ সাদা ইশতেহারে রয়েছে যা সবুজ ইশতেহারের তিন বছর প্রকাশিত হয়েছিল। আর সর্ব কনিষ্ট শরীফ-এর জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী জিয়াউল হক এবং আনোয়ারুল ইসলাম পুস্তকে রয়েছে।"

(আঞ্জামে আথাম, পরিশিষ্টাংশ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড=১১, পৃ: ২৯৯)

অনুরূপভাবে হযরত আকদস (আ.) সিররুল খোলাফা পুস্তকে লেখেন-

"আমি তোমাকে একটি অদ্ভত ঘটনা এবং একটি আশ্চর্যজনক বিষয় শোনাচ্ছি। বশীর নামে আমার বড় আদরের এক ছেলে ছিল। দুধ খাওয়ার বয়সে আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দেন। যারা তাকওয়া ও খোদাভীতির পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহ্ই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি তাদের চিরসাথী। আমার প্রতি ওহী হল, আমরা তোমার প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ তাকে ফেরত পাঠাবো, একইভাবে তার মা-ও স্বপ্নে দেখেছেন, বশীর ফিরে এসেছে আর বলছে, আমি আপনাকে আঁকড়ে ধরে রাখব আর হঠাৎ করে ছেড়ে চলে যাবো না এরপর আল্লাহ্ আমাকে আর এক পুত্রসন্তান দান করলেন আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তখন আমি বুঝলাম,সর্বজ্ঞানী খোদা সত্য বলেছেন, সে-ই বশীর এবং তার নামানুসারে আমি এর নাম রাখলাম আর আমি এর মাঝে পূর্ববর্তী সন্তানের অবয়ব দেখতে পেলাম। সুতরাং আল্লাহ্র যে রীতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তা হল তিনি দু'ব্যক্তিকে একই নামের অংশীদার করে থাকেন।"

(সিররুল খোলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৮১)

সবুজ ইশতেহার প্রসঙ্গেই নিজের ছেলে মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব জন্মের বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা 'তিরইয়াকুল কুলুব' পুস্তকে লেখেন-

'আমার প্রথম পুত্র, যে বর্তমানে জীবিত আছে, তার নাম মাহমুদ। তার জন্মের পূর্বে আমি দিব্য-দর্শনে তার জন্মের সংবাদ পেয়েছিলাম। মসজিদের দেওয়ালে আমি তার নাম 'মাহমুদ' লেখা দেখতে পাই। তখন আমি সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি ছাপানোর জন্য সবুজ রঙের পাতায় একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছিলাম যার প্রকাশনা তারিখ ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বর। "

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ২১৪)

তিরইয়াকুল কুলব পুস্তকেই তিনি লেখেন-

'আমার জেষ্ঠ্য পুত্র মাহমুদের জন্মের বিষয়ে ১৮৮৮ সালের ১০ জুলাই-এর ইশতেহারে এবং ১০ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত সবুজ ইশতেহারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল আর সবুজ ইশতেহারে এও লেখা হয়েছিল যে, জন্ম নেওয়া সেই পুত্রের নাম রাখা হবে মাহমুদ। আর মাহমুদের জন্মের পূর্বেই এই ইশতেহার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ঘরে হাজার হাজার সবুজ রঙের ইশতেহার পড়ে থাকবে। অনুরূপভাবে ১০ই জুলাই -এর ইশতেহারটি প্রত্যেকের ঘরে পড়ে থাকবে। অতঃপর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ইশতেহারের মাধ্যমে পুর্ণাঙ্গীনভাবে প্রচার করা হল আর মুসলমান, খৃষ্টান কিম্বা হিন্দুদের কোনও ফির্কা এই সংবাদ থেকে অজ্ঞাত থাকল না, তখন খোদা তা'লার কৃপা ও করুণায় ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী মোতাবেক ৯ জামাদিউল আওয়াল ১৩০৬ হিজরী সোমবারের দিন মাহমুদের জন্ম হল। "

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ২১৯)

"অনুরূপভাবে যখন আমার প্রথম সন্তান মৃত্যু বরণ করল তখন নির্বোধ মৌলবীরা, তাদের বন্ধু-বান্ধবরা, খৃষ্টানরা ও হিন্দুরা তার মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করল। বারবার তাদেরকে বলা হল যে, ১৮৮৬ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারীতে এটিও একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, কোন কোন ছেলের মৃত্যু হবে। অতএব, অল্প বয়সে কোন কোন ছেলের মৃত্যু বরণ করা নিশ্চিত ছিল, এতদ্বসত্ত্বেও ঐ সকল লোক আপত্তি উত্থাপন করা থেকে বিরত হল না। তখন খোদা তা'লা আমাকে অন্য একটি ছেলের সুসংভাদ দিলেন। বস্তুত: আমার সবুজ ইশতেহারের সপ্তম পৃষ্ঠায় ঐ ছেলেটির জন্ম হওয়ার ব্যাপারে এই সুসংবাদ আছে: "দ্বিত্বীয় বশীর দেওয়া হবে। তার অন্য নাম মাহমুদ। যদিও সে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৮৮ সালের ১লা সেপ্টেম্ব পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নি।, তথাপি সে খোদা তা'লার ওয়াদা অনুযায়ী মেয়াদের মধ্যে নিশ্চয় জন্ম গ্রহণ করবে। যমীন আসমান টলে যেতে পারে, কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি টলা সম্ভব নয়।' এ সকল কথা সবুজ ইশতেহারের সপ্তম পৃষ্ঠায় লেখা আছে। তদনুযায়ী ১৮৮৯ সালের জানুয়ারীতে ছেলের জন্ম হল। তার নাম মাহমুদ রাখা হল। খোদার ফযলে সে এখনও জীবিত আছে। তার বয়স এখন সতেরো বছর।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ:৩৭৩-৩৭৪)

হাকীকাতুল ওহী পুস্তকেই হুযুর (আ.) ৩৪ নং নিদর্শনে সবুজ ইশতেহার পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের জন্মের উল্লেখ করে বলেন-

"আমি একটি সবুজ রঙের ইশতেহারে এই বিষয়টি হাজার হাজার সমর্থনকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের নিকট প্রকাশ করলাম। তখনও ছেলেই মৃত্যুর সত্তর দিন পার হয় নি, এমন সময় এই ছেলের জন্ম হল এবং তার নাম মাহমুদ রাখা হল। "

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ:২৭৭)

প্রারম্ভে একথার উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সবুজ ইশতেহারে আল্লাহ্ তা'লার দুই প্রকারের করুণার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটির সত্যায়ন স্থল হল বশীর (প্রথম) মরহুম এবং ঐশী করুণার দ্বিতীয় প্রকারটির (অর্থাৎ মুরসাল, নবী , ইমাম, আওলিয়া ও খলীফা) জন্য দ্বিতীয় বশীর দেওয়ার ঘোণা করেছেন, যার দ্বিতীয় নাম হবে মাহমুদ। একথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, হুযুর (আ.) তাঁর এক ছেলের নামই বশীর ও মাহমুদ রেখেছেন অন্য কোনও ছেলের নাম মাহমুদ রাখেন নি।

যুগ ইমামের বাণী

খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপুত করে দিবেন। - *(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)*

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

অতএব, সবুজ ইশতেহারে এই বশীর ও মাহমুদকে হুযুর দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই প্রতিশ্রুত পুত্র প্রসঙ্গে অন্যান্য কিছু স্থানেও একথার উল্লেখ করেছেন। যেমন- হুযুর তাঁর রচনা আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম-এর এই প্রতিশ্রুত সংস্কারকের ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে টিকায় লিখেছেন-

অনুবাদ: আঁ হরত (সা.) এই সংবাদ দান করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণ হলে তিনি বিবাহ করবেন আর তাঁর সন্তানও হবে। এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে (প্রতিশ্রুত মসীহকে) এমন এক পুণ্যবান পুত্র সন্তান দান করবেন যে নিজের পিতা সদৃশ হবে আর সে পিতার বিরুদ্ধে যাবে না আর সে আল্লাহ্ তা'লার সম্মানিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর মধ্যে এই রহস্য নিহিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আম্বিয়া ও আওলিয়াদের মধ্য থেকে তখনই কোনও বংশধরের সুসংবান করেন যখন তাকে খোদা পুণ্যবান সন্তান দান করা নির্ধারিত করে রাখেন। আর এটি (প্রতিশ্রুত সন্তানের) সেই সুসংবাদ যার সুসংবাদ আমাকে কয়েক বছর পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। আর নিজের (মসীহ ও মাহদী হওয়ার) দাবিরও পূর্বে।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৭৮)

অতঃপর হুযুর (আ.) রচনা 'এযাজুল মসীহ' পুস্তকে লেখেন-

অনুবাদ:আর যখন আমি (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-অনুবাদক) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিব, তখন আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত, সেই প্রতিশ্রুত পুত্র ছাড়া যার সম্পর্কে আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণীতে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য কোনও মসীহ আসবে না, কিম্বা আকাশ থেকে অবতরণ করবে না কিম্বা কোন গুহা থেকে বের হবে না।"

(এজাযুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৭৩)

আর টিকায় হুযুর (আ.) 'فَيَتَزَوَّجُ وَيُوْلَدُ لَه'-বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হুযুর (আ.) তাঁর প্রতিশ্রুত পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে আঁ হযরত (সা.) বর্ণিত 'فَيَتَزَوَّجُ وَيُوْلَدُ لَه' হাদীসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই পুত্র সন্তান তাঁরই দেহজাত হওয়া নির্ধারিত ছিল, কেননা, ভবিষ্যতে যদি কোনও সময় আধ্যাত্মিকভাবে অন্য কোন পুত্রের উল্লেখ থাকত, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এই হাদীসের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন ছিল না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'খোদা তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, আমি তোমার জামা'তের জন্য তোমারই বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে দন্ডায়মান করব এবং তাঁকে আমার নৈকট্য ও ঐশী বাণীর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করবো। তাঁর দ্বারা সত্যের উন্নতি হবে এবং বহু লোক সত্যকে গ্রহণ করবে।

অতএব, সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা কর। তোমরা স্মরণ রাখবে যে প্রত্যেকের পরিচয় তার জন্য নির্ধারিত সময়ে পাওয়া যায় এবং তৎপূর্বে তাকে একজন সাধারণ ব্যক্তি বলে মনে হতে পারে অথবা কোন ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ তাকে সমালোচনার যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর। যেমন এক সময়ে যিনি একজন কামেল পুরুষ হবেন, নির্দিষ্ট কাল পূর্বে তিনিও মাতৃগর্ভে 'নুৎফা' (বীর্য) অথবা ঘনীভূত রক্তস্বরূপই অবস্থান করেন।

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ-৩০৬)

যেমনটি সবুজ ইশতেহারে হুযুর (আ.) দ্বিতীয় বশীর ও মাহমুদকে 'মুরসালীন, নবীকুল, ইমাম, আওলিয়া ও খলীফাগণ'-এর কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অনুরূপভাবে আল ওসীয়্যত পুস্তিকায় " আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি হবেন যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন"-একথার উল্লেখ করে তিনি সেই প্রতিশ্রুত পুত্রকেও দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং, এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে দ্বিতীয় কুদরতের প্রথম বিকাশস্থল হযরত হাকীম মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেব ভেরবী (রা.)-এর তিরোধানের পর আল্লাহ্ তা'লা হযরত আকদস (আ.)-এর বংশধর থেকে সেই প্রতিশ্রুত পুত্র অর্থাৎ বশীর সানি (দ্বিতীয়) কে-ই দ্বিতীয় কুদরতের দ্বিতীয় বিকাশস্থল হিসেবে নির্বাচিত করেন। আর যেমনটি হযরত আকদস (আ.) বলেছিলেন, প্রতিটি বস্তুকেই যথাসময়ে সনাক্ত করা হয়।' অতএব, পরবর্তী যুগ প্রমাণ করেছে যে, সেই মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ-ই হলেন প্রতিশ্রুত সংস্কারক আর আল্লাহ্ তা'লা মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে যে বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করেছিলেন তা একে একে সবগুলিই হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ সাহেব (রা.)-এর সত্তায় পূর্ণ হয়েছে।

১৯০৬ সালে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব আল মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি পারিবারিক বিষয় নিয়ে লাহোর আসেন। সেই সময় 'পয়সা' পত্রিকার সম্পাদক মুনশী মাহাবুব আলম সাহেবযাদার লাহোর আগমণের বিষয়ে সংবাদ উপস্থাপন করে ব্যঙ্গ করে লেখেন-'বড় ছেলেটি সন্তানের পিতা, কিন্তু জানা গেছে সে মিডল ফেল। যদি মির্যা সাহেবের পর এই ছেলেটিই তাঁর স্থান নেয়, তবে ধর্ম খুব ভাল পরিচালনা করবেন।'

(আল হাকাম পত্রিকা, ১৭ই জুলাই, ১৯০৬, পৃ: ২, ৪র্থ কলাম)

হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব (রা.) পয়সা পত্রিকার সেই সংবাদ পরিবেশনের উত্তর সেই সময়ই আল হাকাম পত্রিকায় দিয়েছিলেন। কিন্তু একটি উত্তর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেওয়া এখনও বাকি ছিল। যে ছেলে সম্পর্কে বলা হয়েছিল,' মির্যা সাহেবের পর এই ছেলেটিই যদি তাঁর স্থান নেয়, তবে সে খুব ভাল ধর্ম পরিচালনা করবে, আল্লাহ্ তা'লাকেই খলীফার আসনে সমাসীন করে জগতবাসীকে দেখিয়ে দেন; আর তাঁরই মাধ্যমে আহমদীয়াতের বাণী পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছেছে, তাঁরই সত্তা থেকে জাতি সমূহ আশিস লাভ করেছে, তাঁরই মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম তথা আল্লাহ্র বাণীর সম্মান ও মর্যাদা মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরই পরিত্রাণকারী সত্তা ও পবিত্র আত্মার কল্যাণে বহুজনকে ব্যধিমুক্ত হয়েছে।তাঁরই প্রখর ধীশক্তি ও প্রজ্ঞা এক বিশাল জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়েছে এবং অনেক বন্দীদের মুক্তির কারণ হয়েছে। সেই পুত্র শত্রু ও বিদ্বেষপরায়ণদের বিরোধিতা, অভিসম্পাত, গালিগালাজ, বিদ্বেষ এবং অরাজকতা সত্ত্বেও দ্রুতি বর্ধিত হয়েছে এবং জগতজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। হযরত আকদস (আ.))এর এই কথাটি কিরূপ মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে-

আমি জানি, যে বিষয়গুলি প্রকাশ করার জন্য আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি, সংশয়াসক্ত যুগ সেগুলিকে যতই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখুক না কেন, অনাগত ভবিষ্যত এর থেকে প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৪-৩০৫)

হে খোদার সম্মানিত মসীহ ও মাহদী! তোমার উপর হাজার হাজার রহমত ও সালাম। আমরা তোমার নির্দেশিত লক্ষণাবলী অনুসারে সেই প্রতিশ্রুত সংস্কারককে চিনেছি এবং তাঁর কল্যাণময় সত্তা থেকে উপকৃত হয়ে নাজাত ও সফলতার পথ সম্পর্কে অবগত হয়েছি।"

****

১৮ পাতার পর.....

তোমাদের মধ্যে ঈমানী আত্মাভিমান অবশিষ্ট থাকে/

অনেক ভাগ্য করে জাতির জন্য এমন সময় এসে থাকে/

পৃথিবীতে যেন কোনও মুসলমান অবশিষ্ট না থাকে।"

কিন্তু জামাত আহমদীয়া জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতেই আর্য সমাজীরা তাকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য বিপদ বলে অভিহিত করল। আর কোনও সাধারণ বিপদ নয়, বরং তা এতটাই বড় যে, তাদের সচেতন নেতারা ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে,'এর পরিণামে আর্য জাতির অস্তিত্ব মুছে যেতে পারে।"

কি অদ্ভুত তুলনা! লেখরাম যে শিশুর অস্তিত্ব মিটে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করল, সেই শিশুটিই তার জাতির জন্য এত বড় বিপদ হয়ে উঠল যে পরিণামে সমগ্র জাতির অস্তিত্বই মুছে যেতে পারে। সত্যের এমন অকপট স্বীকারুক্তির মাঝেও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য কি কোনও শিক্ষনীয় নিদর্শন নেই? যাদের মধ্যে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস রয়েছে, তাদের জন্য আর্য সমাজের এই পরাজয় স্বীকারের মাঝে কি কোনও নিদর্শন নেই?

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১১-৩৩৪)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: আমি আদম সন্তানের নেতা। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (MSD)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, সেপ্টেম্বর (২০২২)

জেইফ উইলিয়ামস নামে এক ভদ্রলোক নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: শান্তি ও মানবতার বাণী শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। খলীফা চান, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করি আর এই কারণেই এখানে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। যদিও এ নিয়ে আমার আক্ষেপ আছে যে, হুযুরকে একথার উল্লেখ করতে হয়েছে যে, মসজিদ কারো জন্য বিপদের কারণ নয়। আমি আনন্দিত যে, তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন। এই অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত। নিঃসন্দেহে এটি একটি সুন্দর মসজিদ। এখানে প্রত্যেকেই ইবাদতের জন্য আসতে পারে। এটাও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বিষয় যে, কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন দেশের মানুষ হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে হুযুরের কথা শুনতে এবং এই মসজিদের উদ্বোধনের জন্য সমবেত হয়েছে।

* সুলতান সাহেব নামে এক অতিথি বলেন: হুযুর আনোয়ার সমগ্র পৃথিবীর জন্য যে শান্তির বার্তা দিয়েছেন, আমার মতে সেটি এক উৎকৃষ্ট বাণী। মুসলমানেরা এখানে এসে সব কিছু দখল করে নিবে, আমার মতে, মুসলমানদের সম্পর্কে এই ভীতি দূর করা জরুরী। হুযুর একথা স্পষ্ট করেছেন যে, যেহেতু মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে না, তাই মুসলমানদের জন্য যুদ্ধাভিযানের কোনও বৈধতা নেই।

* ক্রিস্টার রাগল্যাণ্ড নামে এক অতিথি বলেন: এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। হুযুর সমগ্র বিশ্বের ধর্মসমূহের সঙ্গে শান্তি ও সমন্বয় সহকারে বসবাস করার উপদেশ করেছেন। তাঁর এই উপদেশকে আমি সমাদরের দৃষ্টিতে দেখি। হুযুরের এই আগমণে আমি ভীষণ আনন্দিত।

* এক স্থানীয় অতিথি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: এই ধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল। আর এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সুখকর ছিল। আমাদের সকলের এটাই বিশ্বাস, ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে। হুযুরের আগমণে আমি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। আমারে ধর্ম ভিন্ন, কিন্তু আমাদের সকলের মূলকথা একটিই। আমার মতে, আমরা আমাদের চিন্তাধারা এবং ধর্মবিশ্বাসকে আমারে সমাজ, প্রতিবেশী ও অন্যান্য সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিলে এর সুপ্রভাব পড়বে। ফেসবুকে এ সম্পর্কে আমি পূর্বেও কথা বলেছি। আর অনুষ্ঠানটিও এমনই একটি সুযোগ ছিল। আমি একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, প্রত্যেকেই আপনাদের জামাতের জন্য শুভেছা জ্ঞাপন করে। সত্যিই আমি বেশ আনন্দিত হয়েছিল। আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ।

লুকার এন্ডারসন নামে অতিথি বলেন: আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। আমি আজ পর্যন্ত মুসলিম কমিউনিটির সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম। আমি এই বাণী শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। আমার বিশ্বাস, আপনাদের মতবাদ বাস্তবায়নযোগ্য এবং আকর্ষনীয়।

*টম বেরি নামে অতিথি বলেন: আমি আপনাদেরকে এবং খলীফাতুল মসীহকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের বাণী, আতিথেয়তা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য অসাধারণ ছিল। ধর্ম ও মতবাদ নির্বিশেষে পরস্পরের হিত সাধনের জন্য কাজ করা, জীবনের মূল্যবোধ ও এর প্রতি ভালবাসা, মানুষের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা- নিঃসন্দেহে এই সব কিছু একটা আশীর্বাদ স্বরূপ। এর থেকে প্রকাশ পায় যে, এমন সমাজে কোনও ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য নেই। সকলে মিলে কাজ করতে হবে। এটিই ছিল খলীফার বাণী। এটি এমন এক বার্তা ছিল যা প্রতিদিন রাত্রিতে ঘুমানোর পূর্বে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে পুনরাবৃত্তি করা উচিত। এই বাণীই আমাদের শিশুদের শেখানো উচিত, কেননা যখন আমরা থাকব না, তখন তারাই এই বাণীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ।

* হেক্টর আমায়া নামে এক অতিথি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সন্দীপ শ্রীবাস্তব ক্যামপেন-এর ফিল্ড ডাইরেক্টর। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: অসাধারণ সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। হুযুরের সঙ্গে করে আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি। তাঁর বাণী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। বিশেষ করে তিনি বিশ্ব-শান্তির বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। নিঃসন্দেহে খলীফা সেই কাজ করেছেন যা এই দেশের রাজনীতিকরাও করেন নি।

* নর্থ প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চ-এর পক্ষ থেকে এক অতিথি বেভারলী ম্যাককর্ড বলেন: বিগত আট-নয় বছর থেকে আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি। আমাদের চাচ আহমদী মহিলাদের সঙ্গে অনুষ্ঠান করত। তারা অনেক সময় চার্চে একত্রিত হয় আবার কখনও কোনও আহমদীর বাড়িতে। আমরা এমন কোনও বিষয়বস্তু নির্বাচন করতাম যার দ্বারা আমরা নিজের নিজের চিন্তাধারার কথা তুলে ধরতে পারি। আমরা একত্রে বসে আলোচনা করতাম, খাবার খেতাম। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান হত আমাদের। অনুরূপভাবে আবারও আমরা একে অপরের উপাসনাগারে যাব এবং আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে নিজের নিজের ধর্মগ্রন্থের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলব। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের। কিভাবে এই বড় অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য একটি বড় দল কাজ সম্পাদন করেছে, কিভাবে তারা পরস্পর মিলেমিশে কাজ করছে- এ সব কিছু দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ ও সময়সূচি রয়েছে। এটা একটা দারুন অভিজ্ঞতা। আমি একথাও শুনেছি যে, কিছু মহিলা কর্মী এই অনুষ্ঠানের জন্য গত ছয় রাত থেকে ভাল মত ঘুমাতেও পারেন নি, কিন্তু তারা সকলেই খুশি। কিছু মহিলা দুঃখ করছিল যে, এত বড় অনুষ্ঠান, এত পরিশ্রম করে আনন্দ পাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। মহিলাদের সেই দলটি আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

খলীফাকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে আমি ভীষণ সন্তুষ্ট হয়েছি। অন্য কোনও ব্যক্তিকে বিশ্ব-শান্তির জন্য এমনভাবে চেষ্টা করতে দেখি নি। এটা অসাধারণ অনুভূতি ছিল। মানুষ যদি নিজের স্বার্থপরতা, প্রতিবেশী দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার, অন্য দেশের ভূখণ্ড দখল কিম্বা অপরের উপর অন্যায় করার পরিবর্তে এই বাণী শোনার প্রতি মনোযোগ দেয় তবে পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে। শান্তির প্রসার সংবলিত বক্তব্য যদি আমরা আরও বেশি করে শুনতে পারতাম এবং মানুষকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারতাম যে সব সময় শান্তির অনুসরণ করা উচিত এবং এর জন্য কাজ করা উচিত!

* অনুষ্ঠানে কলিন কাউন্টি পুলিস বিভাগের লেরয় থম্পসন অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, এটি সুন্দর একটি অনুষ্ঠান ছিল আর থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটি সত্যিকার অর্থেই অসাধারণ কাজ করেছে। কমিউনিটির বাইরে অন্যান্য মানুষেরর জন্য খলীফার বার্তা খুব ভাল ছিল। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুসংগঠিত ছিল আর এর উপস্থাপনাও ছিল অসাধারণ। আমার আকাঙ্খা আপনাদের মত কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং আরও বেশি করে শেখা।

এই অনুষ্ঠানে এডেলিন মোরা নামে এক যুবতী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, অনুষ্ঠান খুব সুন্দর ছিল। হুযুরের কথা শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। জার্মানী জামাতের শীর্ষ নেতা আমার কাছে বসে ছিলেন আর রাত্রিতে খাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে।

* ডক্টর হালীমুর রহমান নামে এক অতিথি বলেন: এটা অত্যন্ত অবিশ্বাস্য বিষয় ছিল। অনুষ্ঠান, ব্যবস্থাপনা, আতিথেয়তা, প্যান্ডেল ও পরিবেশ আমার খুব ভাল লেগেছে। আমাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ। আমি এই সম্মান লাভের যোগ্য ছিলাম না যা আপনারা আমাকে দিয়েছেন। এই পরিবেশ দেখে, এবং আমার প্রতি আপনাদের সম্মান প্রদর্শন দেখে আমার চোখ ছলছল করে উঠেছে। এই স্মৃতি আমার মনে চির অম্লান থাকবে। আমার পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। আমি সর্বোত্তম মানুষদের মাঝে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছি, এমন মানুষ যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

*ম্যারি ম্যাকডারমট নামে অতিথি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পার্কিং এর জন্য জামাতকে জায়গা দিয়েছিলেন। নিজের আবেগ অনুভূতির কথা জানিয়ে তিনি বলেন: এমন বিচিত্র সান্ধ্য অনুষ্ঠানের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আমার এই অপরিচ্ছন্ন জমিটি নিয়ে এর আগে আমি কখনও এতটা আনন্দিত হই নি যতটা এই অনুষ্ঠানের জন্য দেওয়ার পর আনন্দিত হয়েছি। এখানে এসে অনেক সম্মান পেয়েছি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

লরা নামে এক ভদ্রমহিলা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। তিনি বলেন: অনুষ্ঠানে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল আর খাদ্য অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল।

* জাসুয়া মোরে নামে এক অতিথি বলেন: আমাদের ঠিক সেই কাজই করা উচিত যা নৈতিকভাবে সঠিক। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে আমার মতে এই বার্তা সময়ের প্রয়োজন। এছাড়া পারস্পরিক ঐক্যের এই বাণী এই কাউন্টিতেই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বেই শোনা উচিত।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 2-9 Feb, 2023 Issue No. 5-6

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সিন্ডি ওয়াকার নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: তিন বছর থেকে আমি জামাতের এক মুবাল্লিগের প্রতিবেশী হিসেবে থাকি। আজকের এই অনুষ্ঠান আমার জন্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। আমার জন্য আশ্চর্যের বিষয় ছিল হুযুর সেই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন যা আমি কখনও কল্পনাও করি নি যে একটি মসজিদের পরিবেশে একথার কি প্রভাব পড়বে। কিন্তু আমি অনুমান করতে পারছি যে, আমরা সেই কমিউনিটির সঙ্গে বাস করছি যেখানে বিষয়টিকে অত্যন্ত গভীরভাবে নেওয়া হয়। আমি দেখে আশ্চর্য হয়েছি যে, (হুযুর আনোয়ার) এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে চাইছিলেন যে তিনি যেন সেই সব আশঙ্কা নির্মূল করেন আর একথা আমি ভালভাবে অনুধাবন করেছি। যতটুকু সময় আমি এখানে ছিলাম আমি এই জামাত থেকে শুধু ভালবাসা,সম্মান ও স্নেহই পেয়েছি।

*মেলিসা ম্যাকনিলি নামে এক অতিথি বলেন: আমাদেরকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আর এর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমরা একটা দল হিসেবে এখানে এসেছিলাম জামাত আহমদীয়ার এই নতুন মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। শান্তি, পারস্পরিক সমন্বয়, ঐক্য এবং অন্যান্য কমিউনিটির জন্য সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বাণী আমার ভাল লেগেছে। আমরা আপনাদের কমিউনিটি, মসজিদ আর যে বাণী আপনারা নিয়ে এসেছেন সকলকে সাদরে স্বাগত জানাচ্ছি। হুযুর আনোয়ারের এই কথাটির প্রশংসা আমাকের করতেই হবে, যেখানে তিনি বলেছেন- এই মসজিদ নির্মাণের কারণে কারো মনে যদি কোনও আশঙ্কা তৈরী হয়ে থাকে তবে সেই আশঙ্কা আমাদেরকে দূর করতে হবে। এছাড়াও আমি বলতে চাই যে, আপনাদের মূল মতবাদ এবং শান্তিপূর্ণ বাণী এবং পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট দূর করার বাণী অসাধারণ।

*আব্বি কিরকেন্ডাল নামে এক অতিথি বলেন: আমি এমন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যাদের উপাসনার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও আমাদের মূল্যবোধা যেন একই রকম হয়। আমার জন্য এটি এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এক ধর্মীয় নেতা, যিনি সকল সম্প্রদায়কে নিজেদের মধ্যে একীভূত করতে আগ্রহী, তাঁর মুখ থেকে এমন মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলতে শোনা আমার জন্য গর্বের বিষয় ছিল। এখানে আসার পূর্বে হুযুর এবং আপনাদের জামাত সম্পর্কে খুব বেশি জানতাম না। এখানে এসে আমি যেন খোদার অস্তিত্ব অনুভব করছিলাম। মতবাদ নির্বিশেষে একদিকে আপনি যেমন খোদার অস্তিত্ব টের পান, তেমনি অপরদিকে আপনি এক মানসিক শান্তি লাভ করেন, যা ধর্ম বর্ণ জার্তি নির্বিশেষে এখানে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিই লাভ করেছে আর এটিই সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রয়োজন।

*নিকোলো কলিয়ার নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: কিভাবে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে এখানে একটি মসজিদের মধ্যে স্বাগত জানানো হচ্ছে এবং পারস্পরিক ভেদাভেদ মুছে ফেলা হচ্ছে, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এমন সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে আমি অভিভূত। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। এমনিতেও আমি কর্মসূত্রে অনেক সম্মানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাত করে থাকি, কিন্তু হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত আমার জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি তাঁকে কেবল শান্তি ও সমন্বয় নিয়েই কথা বলতে শুনেছি। তিনি স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন যে, এখানে মুসলমানদের উপস্থিতি নিয়ে তাদের বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কেননা, মুসলমান সম্প্রদায় শান্তির পথের পথিক আর এটি আমাদের উভয়ের মূল্যবোধকে মিলিয়ে দেয়। তাই স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। আমরা যখন এখানে পুলিশ প্রধান, মেয়র, কাউন্সিল সদস্য, কংগ্রেস ম্যান প্রমুখ বড় বড় অফিসারদের দেখি, তখন এর থেকে বোঝা যায় যে, এখানে মসজিদ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে করি যে, হুযুর তাঁর মূল্যবান সময় বের করে এখানে টেক্সাসে এসেছেন এবং নিজের চিন্তাধার ব্যক্ত করেছেন। তিনি আমাদেরকে এবিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন যে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমরা সকলে সার্বিকভাবে কেবল শান্তিই চাই। আমরা ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূর করে ভালবাসার সঙ্গে মানুষকে স্বাগতজানাই। এটিই প্রকৃত বাণী।

*ডানা প্রেসলার নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমি এখান থেকে মাত্র দুই মিনিটের দূরত্বে বাস করি। আর আমাদের ফির্কার মসজিদও এখান থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পায়ে হাঁটা দূরত্বে অবস্থিত। আমাদের কিছু প্রতিবেশী আহমদী মুসলমান, তাঁদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তারা যখন অন্যান্য লোকদের এখানে মসজিদের বিষয়ে বলছিলেন এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করছিলেন যে, এখানে মসজিদ তৈরী হচ্ছে আর আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কেননা আমরা চরমপন্থী মুসলমান নই, বরং শান্তিকামী মুসলমান- এমন আশ্বাস দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

*জোশুয়া এসপ্রাযা নামে এক অতিথি বলেন: আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাকে এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ পাদ্রীদেরকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। আমি এই বিষয়টিকে অত্যন্ত সমাদরের দৃষ্টিতে দেখি যে, এখানে কিভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় শান্তি, ঐক্য এবং ন্যায় বিচারের বিষয়ে আলোচনা করা হল। এবিষয়টিও অনুভূত হল যে, এখানে এমন মানুষও রয়েছে যারা ভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতিনিধি, কিন্তু তারাও আমাদের জনজীবনে খোদার অস্তিত্ব এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতার প্রচার করছে এবং যেহেতু আমাদের কর্ম একে অপরের উপরও প্রভাব ফেলে, তাই এভাবে এক সঙ্গে বসে খাওয়া এবং কথা বলা অত্যন্ত জরুরী ছিল।

আমি আমার স্ত্রীকেও বলছিলাম যে, এখানকার আতিথেয়তা উৎকৃষ্ট মানের ছিল। এখানে পৌঁছেই অনুভব করেছি যে সব কিছু সুব্যবস্থিত এবং নিখুঁত রয়েছে। ব্যবস্থাপকরা সত্যিকার অর্থেই আতিথেয়তা করেছেন আর আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। খাদ্য অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল। আমিও এটা অনুভব করেছি যে, আমরা কেন এমন অতিথিপরায়ন মানুষদের আমন্ত্রিত করি না। এই প্রথমবার আমার জন্য এখানে আসার সুযোগ হল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি নিজের বাড়িতে আছি। আমার জন্য এটা অত্যন্ত সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল।

*ভিক্টোরিয়া এসপ্রেযা নামে এক সম্মানীয় মহিলা বলেন: এখানে এসে যে জিনিসটি স্পষ্টভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটি হল হুযুরের ভাষণ। যেভাবে তিনি একথা তুলে ধরেছেন যে, ধর্মীয় মতানৈক্য এবং ভিন্ন মতবাদ সত্ত্বেও আমরা সকলে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা আমাকে অভিভূত করেছে। আমার মতে, এটি এমন একটি বিষয় যা বর্তমান যুগে আন্তধর্মীয় সংলাপের মত ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আজ কাউকে এ বিষয়টি নিয়ে এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথা বলতে দেখে ভীষণ আনন্দিত হলাম। এই আলোচনা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, কিভাবে নিজেদের ধর্মীয় মতবাদের ভিন্নতা সত্ত্বেও সমগ্র মানবজাতি একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর কিভাবে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে এবং পরস্পরের আবেগ অনুভূতির বিষয়ে যত্নবান থেকে জীবন অতিবাহিত করা উচিত। আজকের অনুষ্ঠান এবং আতিথেয়তা সকল দিক থেকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ছিল। আমাদের প্রতি অনেক যত্ন নেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। এর থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। এই সব কিছুর জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

বেভারলী ম্যাককর্ড নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: ধর্ম জগতের বিশ্ব-নেতাদের শুনতে আমার সব সময় ভাল লাগে। তাঁরা সব সময় মানুষকে শান্তির প্রয়োজনীয়তা, পারস্পরিক ভেদাভেদের অবসান এবং সম্প্রীতির দিকে আহ্বান করে থাকেন। আমি সব সময় এমন বাণী শুনে আনন্দিত হই। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই জামাতের বিষয়ে মোটেই আশঙ্কিত নই, আর অন্যদের আতঙ্কিত হওয়ার

এরপর ৮ পাতায়....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir